ভাষা-শহীদ

গ্রন্থমালা

অমর একুশে বাংলা একাডেমীর নিবেদন

পাখির জগৎ

আলী ইমাম

বাংলা একাডেমী ঢাকা

ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা

বা/এ ॥

পাণ্ডুলিপি : সংকলন উপবিভাগ

প্রকাশক : শামসুজ্জামান খান পরিচালক গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রক : ওবায়দুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

মূল্য : পনেরো টাকা মাত্র ॥ বিদেশে : দেড় মার্কিন ডলার

BHASHA-SHAHEED GRANTHAMALA : Series in honour of the martyrs of the Language Movement of February 1952.

PAKHIR ZAGOT [The World of Bird] by Ali Imam. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh : 5 Poush 1392/21 December
Price: Taka 15·00 only; Outside Bangladesh US Dollar 1·50 only

উৎসর্গ

উপমহাদেশের
পথিকৃৎ পাখিবিজ্ঞানী
ড: সলীম আলী-কে

প্রসঙ্গ-কথা

বাহান্নোর ভাষা-শহীদেরা মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর দেখতে চেয়েছিলেন, সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় অবাধ বিচরণ আজো স্বপ্ন। এ স্বপ্নকে খানিক-টুকু হলেও সত্য ক'রে তোলার এক বিনীত চেষ্টা থেকে এ গ্রন্থমালা।

বাংলা একাডেমী সকলের একাডেমী। সবারই দাবি এর উপর। এ গ্রন্থমালার বই তাই সবার জন্যে। কেবল বিশেষজ্ঞের জন্যে নয়, কেবল শিক্ষার্থীর জন্যে নয়। নানা বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থমালা — জ্ঞানের সব দিগন্তই যেন একদিন ছুঁতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অনেকেই এই প্রথম বারের মতো লিখলেন কিংবা এই প্রথম বারের মতো বাংলায় লিখলেন। আমাদের চিন্তার ভুবনে নতুন কণ্ঠ বড়ো প্রয়োজন।

পাখিহীন প্রকৃতি যেমন ভাবা যায় না তেমনি পাখির জগৎ এক বিচিত্র পৃথিবী। পাখির বাসা যে কত রকমে এবং কত কৌশলে নির্মিত হয় তা এক বিস্ময়, আরো বিস্ময় পাখির বাসার সৃপ। পাখির পরিচয়, যাযাবর পাখি, অবলুপ্তির পথে পাখি ইত্যাদি অসংখ্য তথ্য দিয়ে ভরা এ বই।

এ গ্রন্থমালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মী ও অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

ভাষা-শহীদদের বারবার শ্রদ্ধা জানাই।

মনজুরে মওলা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

পাখির পরিচয়

পাখি মানুষের কাছে একটি প্রিয় প্রাণী। বিচিত্র রংয়ের পালক আর অপূর্ব সুরের ডাক দিয়ে পাখি মানুষকে আকৃষ্ট করে। অনেক পাখির ডানা রামধনুর সাতটি রংয়ের মতো ঝিলমিল। অনেক পাখির মিষ্টি শিস গানের মতো সুরেলা। অতীতকাল থেকেই মানুষ পাখির এই বৈচিত্র্যময় রূপে মুগ্ধ।

অরণ্যচারী মানুষ দীঘল ঘাসবনে কিংবা পাহাড়ী প্রান্তরে শিকারের খোঁজে ছুটতে গিয়েও কোনো চমৎকার বর্ণের উড়ন্ত পাখিকে দেখে হয়েছে মুগ্ধ। বিস্মিত। প্রাচীনকালের বিভিন্ন গোত্রের নামকরণ করা হতো পাখিদের নামে।

সতেরো আঠারো হাজার বছর আগের স্পেনের পাথুরে-যুগের মানুষেরা তাদের গুহার দেয়ালে এঁকে রেখেছে পাখির ছবি।) (ইউফ্রেতিস নদীর তীরে গড়ে-ওঠা সুমেরীয় সভ্যতার স্থাপত্যে রয়েছে পাখির অবয়ব।) (প্রাচীন মিশরের থিবস নগরীতে অবস্থিত নাখতের সমাধি-মন্দিরের দেয়ালে রয়েছে নানা প্রজাতির পাখির চিত্র। (ইতেতের সমাধিক্ষেত্র থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে আড়াই হাজার বছর আগের দেয়াল চিত্র। যাতে আঁকা রয়েছে নীল নদের অববাহিকায় বছরের একটি বিশেষ সময়ে আসা বুনোহাঁসের নলখাগড়ার বনে বাসা বাঁধার দৃশ্য।) আরো রয়েছে বিভিন্ন সারস গোত্র এবং দিগহাঁস ও জলচর পাখিদের ছবি।)

সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম নগরী মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীরা তাদের তৈজসপত্রের গায়ে এঁকেছে পাখির ছবি।

বিভিন্ন দেশে পাখিদের নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিচিত্র গল্প ও উপকথা। আকর্ষণীয় পুরাণ কাহিনী।

মিশরের মৃত্যুদেব সেকের এর মুখ শিকারী বাজপাখির মতো। সূর্যদেব হোরাসের ও পশ্চিম দিকের দেবতা আমেনত-এর মুখ বাজের মতো। এ-ছাড়া জ্ঞান ও চিত্রলিপির দেবী খোত-এর মুখও আইবিস পাখির আদলে পরিকল্পিত হয়েছে।

প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার যে-সব ধ্বংসাবশেষ উর অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে তার নানা স্থানে পাখি-দেবতার মূর্তি পাওয়া গেছে।

এ-ভাবেই পাখির সাথে মানুষের দীর্ঘদিন থেকে গড়ে উঠেছে একটি নিবিড় সম্পর্ক।

কোথায় নেই পাখি? পৃথিবীর সবখানেই দেখা যায় এদের। হিমশীতল মেরু অঞ্চল থেকে উত্তপ্ত মরুভূমি। ঘন অরণ্য থেকে পাহাড়ী এলাকা। সবখানে ছড়িয়ে রয়েছে পাখি। পরিবেশকে করে তুলছে আকর্ষণীয়।

পাখিদের শরীর ঢাকা থাকে পালকে। এরা ডিম পাড়ে। নিজেদের শরীরের উত্তাপ দিয়ে সেই ডিম ফোটায়। পাখিরাই হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র পালকবিশিষ্ট প্রাণী।

পাখিদের জগৎ বিশাল এবং বিচিত্র। বহু ভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে পাখি। তাদের জীবনযাত্রা জানার জন্যে হয়েছে কৌতূহলী। কেমন করে নীল আকাশে উড়ে যায় ডানা মেলে। গাছের ডালে বাঁধে বাসা। পেরিয়ে যায় উত্তাল সমুদ্র। বিচিত্র রংয়ের পালক সোনালি রোদের ভেতরে করে ঝিলমিল। কতো রকমের ডাক।

পাখিদের এই বিচিত্র পৃথিবীর প্রতি তাই মানুষের এতো আগ্রহ। অনুসন্ধান। গবেষণা।

গ্রীস দেশের প্রখ্যাত দার্শনিক আরিস্ততল হলেন প্রথম উল্লেখযোগ্য পাখি-বিশারদ। তিনি পাখিদের জীবনযাত্রা নিয়ে গবেষণা করে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর লেখাতে ১৭০ জাতের পাখির উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি চেয়েছিলেন পাখিদের একটি বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগ করতে।)

অনেক বিজ্ঞানীদের মতে, পাখি প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে উড়ন্ত সরীসৃপ থেকে।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস ডারউইন প্রথম বললেন—পাখির পূর্বপুরুষ হচ্ছে সরীসৃপ। তাঁর যুগান্তকারী বিবর্তনবাদ তখন প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মানুষের দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের ভিত ধরে প্রবলভাবে দিচ্ছে নাড়া।

তাঁর মতে, মাছ থেকে সরীসৃপ এবং সরীসৃপ থেকে ধীরে ধীরে বিবর্তনের পথ ধরে সৃষ্টি হয়েছে পাখি।

যে-কোন পাখির পায়ের দিকে তাকালে দেখা যাবে সে অংশটি অনেকটা আংটার মতো গোল গোল জিনিসে তৈরি। এটা সরীসৃপের চিহ্ন।)

তবু পাখিদের উৎপত্তি নিয়ে এখনো বৈজ্ঞানিকেরা সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। তাদের অনেকের ধারণা পাখিদের পূর্বপুরুষ ছিলো উড়ন্ত সরীসৃপ।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর ব্যাভেরিয়ার কালো শ্লেট পাথরের খনিতে প্রথম পাওয়া গেল পৃথিবীর আদি পাখির ফসিল। এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ফসিল মানে পাথরে পরিণত জীবদেহ। কোনো প্রাণী মরার পর অনেক সময় নদীর তলায় এসে জমা হয়।

মাটি জমতে থাকে তার উপর। স্তরের পর স্তরের চাপে অবশেষে পরিণত হয় পাথরে। তার মাঝে সেই মরা প্রাণী পাথরে পরিণত হয়ে হুবহু থেকে যায়। জমে যায় হাড়গোড়সহ। তবে তাতে মাংস থাকে না। লক্ষ লক্ষ বছর আগের পাখিদের খবর পাওয়া যায় ফসিল থেকে।

ব্যাভেরিয়ার শ্লেট খনিটি ছিল লাঙোনাল থেইম এলাকায়। সেই পাখির ফসিল জীববিজ্ঞানীদেব মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। পাখিদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ জানার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো।

সেই ফসিলের পাখির মাথা গিরগিটির মতো। চোয়ালে রয়েছে সারি সারি দাঁত। মেরুদণ্ড হচ্ছে গিরগিটির লেজের মতো পেছন দিকে লম্বা। বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন গিরগিটি থেকে এর বিবর্তন ঘটেছে। লেজ লম্বা। কতগুলো জোড়া দেয়া হাড়ের মতো দেখতে। লেজের দুপাশে থাকতো পালক।

এই আদি পাখির পালক ও হাড়গুলো রাখা আছে বৃটিশ মিউজিয়ামে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিলেন আর্কিঅপটেরিক্স। তাদের ধারণা এর বয়স তেরো বা চৌদ্দ কোটি বছর। তখন পৃথিবীর বুকে বিচরণ করতো অনেক অদ্ভুত আকৃতির বিশাল প্রাণী। ডাইনোসোরাস, ব্রণ্টেসরাস দর্পিতভাবে ঘুরতো। তখন আকাশে উড়তো দাঁতঅলা সরীসৃপ টেরোডাকটিল ও টেরোনডন। সেই যুগের নাম জুরাসিক। এই উড়ন্ত সরীসৃপেরা চামচিকে বাদুড়ের মতো চামড়ার ডানা দিয়ে উড়তো। তাদের হাড় ছিলো ফাঁপা। আদি পাখির বড় বড় নখ ছিলো। তারা গাছে চড়তো ঐ নখ দিয়ে। ডানার শেষ দিকেও ছিলো ঐ ধরনের নখ। আদি পাখিরা ধীরে ধীরে নিজেদের ওড়ার উপযোগী করে তুললো।

জুরাসিক যুগের পর এলো খড়িযুগ বা ক্রেটোসাস। এ যুগের শুরু হয় আনুমানিক সাড়ে দশ কোটি বছর আগে। শেষ হয় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ বছর আগে। এই সময়কার পাখিজাতীয় প্রাণীদের কয়েকটি ফসিল পাওয়া গেছে। এগুলো অনেকটা হাঁসের মতো ডুবুরি জাতের পাখি।) বিজ্ঞানীরা নাম দিলেন হেসপেরেরনিস। আমেরিকার কানসাস রাজ্যের পাহাড়ে পাওয়া গেল আরো দুটো ফসিল।

তারপর এলো পুরা নতুন যুগ। এ যুগটি শেষ হয় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ বছর আগে। বর্তমানকালের উটপাখি, পেলিকান, বক, সারস, পেঁচা, হাঁস, জলচর পাখিদের পূর্বপুরুষের উৎপত্তি হয় এ-সময়।)

পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলে তখন চলছে নানা তোলপাড়। পৃথিবী একবার শীতল আবার গরম হচ্ছে। হিমবাহের ফলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে গাছপালা। অন্যান্য পশুদের মতো পাখিদের জগতেও ঘটছে বিবর্তন। আজকের এই অবস্থায় আসতে পাখিদের ১৪ কোটি বছর পেরিয়ে আসতে হয়েছে। এর মধ্যে বহু জাতের পাখির উদ্ভব আর বিলোপ ঘটেছে। বিজ্ঞানীদের মতে, অতীত ও বর্তমান মিলে আজ পর্যন্ত ১৬,৩৪,০০০ জাতের পাখি জন্ম নিয়েছে।)

বর্তমানে পৃথিবীতে রয়েছে ৮,৬০০ জাতের পাখি।)

এই বিভিন্ন জাতের পাখিদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। আঠারো শতকের সুইডেনের প্রকৃতিবিদ লিনিয়াস প্রথম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। গঠন এবং ক্রমবিবর্তনের মৌল প্রকৃতি অনুসারে সমস্ত পাখির জগতকে ২৭টি প্রধান বর্গে ভাগ করা হয়েছে।)

যে-সব পাখিরা গাছের শাখায় বাস করে তারা এক বর্গের,) (যারা পানির কাছাকাছি বাস করে যেমন সারস ও বকজাতীয় পাখি তারা এক বর্গের) আবার (অন্য দিকে হাঁসজাতীয় সাঁতারু পাখিরা অন্য বর্গের।)

বিভিন্ন বর্গগুলোকে আবার কতগুলো গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে। পাখিদের মধ্যে কতগুলো বিশেষ ধরনের লক্ষণ দেখে তাদের এসব গোষ্ঠীতে ফেলা হয়। এগুলো অনেকটা পরিবারের মতো। গোষ্ঠীর পরবর্তী ভাগ হলো গণ।)

পাখিদের জাতি নির্ণয়ের শেষতম বিভাগ হচ্ছে প্রজাতি। গণকে বিভিন্ন প্রজাতিতে ভাগ করা হয়।)

ভৌগলিক কারণে পৃথিবীর কোথাও সাতাশটি বর্গের পাখির সব ক'টি একই দেশে দেখা যায় না। (আমাদের দেশের জলবায়ু আর প্রাকৃতিক পরিবেশ নানা ধরনের পাখির জন্যে উপযুক্ত। তবুও মাত্র আঠারটি বর্গের পাখি এখানে দেখতে পাওয়া যায়) নিচের বাকি নয়টি বর্গের পাখি আমাদের দেশে নেই।

এক. পেঙ্গুইন—দক্ষিণ মেরুর বাসিন্দা। মোটা শরীর। উড়তে পারে না। ডানা সাঁতার কাটার কাজে লাগে। পালক গায়ে গায়ে আঁশের মত লাগা।

দুই. অস্ট্রিচ—আফ্রিকার বাসিন্দা। বিরাট দেখতে। লম্বা পা। উড়তে পারে না। পায়ে দুটো আঙুল। গায়ে ও ছোট ডানায় পালক অল্প। যেন আলতো করে বসানো।

তিন. রিয়া—দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দা। বিরাট পাখিটির ছোট্ট ডানা। উড়তে পারে না। লম্বা পায়ে তিনটি আঙুল।

চার. ক্যাসাওয়ারি ও এমু—নিউগিনি ও আশেপাশের দ্বীপ এবং অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা।

ক্যাসাওয়ারি। মাথায় হাড়ের ঝুঁটি। ঠোঁট চাপা। গায়ে রুক্ষ পালক। গলায় ঝুলন্ত চামড়া। ডানা খুব ছোট। পা খুব মজবুত। উড়তে পারে না।
এমুর মাথায় ঝুঁটি নেই। গলায় ঝুলন্ত চামড়া নেই। উড়তে পারে না।

পাঁচ. কিউই—নিউজিল্যাণ্ডের বাসিন্দা। লম্বা ঠোঁট। ডানা বলতে কিছুই নেই। পালক চুলের মতো। পা ছোট কিন্তু মজবুত।

ছয়. টিনামুস—দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দা। আকারে মোরগের সমান। মাটিতে চড়ে বেড়ায়। যদিও ডানা ছোট কিন্তু উড়তে পারে। ঠোঁট ছোট।

সাত. লুন—মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি দেশের বাসিন্দা। ডুবুরি পাখি। ঠোঁট শক্ত। সোজা ডানা সুঁচালো। পায়ের গড়ন সাঁতার কাটার জন্যেই যেন। শরীরের অনেকটা পেছনে পা। ডাঙায় চলতে অসুবিধা। আঙুল জোড়া। হাঁসের পায়ের মতো।

আট. অ্যালবাট্রস—এই বর্গে চার রকমের পাখি। সবাই সমুদ্রতীর আর দ্বীপবাসী। অ্যালবাট্রস দক্ষিণ গোলার্ধের বাসিন্দা। অতিকায় ডানা। বহু সময় আকাশে ভেসে থাকতে পারে।

নয়. কলি—আফ্রিকার বাসিন্দা। লম্বা লেজ। মাথায় ঝুঁটি। ছোট ডানা। গাছে গাছেই থাকে। পায়ের আঙুল চারটি সামনের দিকে বাড়ানো। সারা গায়ে ঘন পালক।

পাখির নামাবলি

এক. পানডুবি মেটে রংয়ের পায়রার মাপের ছোট জলার পাখি। ছোট ডানা। লেজ নেই। পেট ধবধবে শাদা। বাসা বানাবার কালে পালকের মেটে রং আরও গাঢ় হয়ে যায়। ঠোঁট ছোট, সরু। আঙুলে লতি রয়েছে, নখ চ্যাপটা। চটপট ডুব দিয়ে খাবার খোঁজে।

দুই. পানকৌড়ির দল: ক. গগনবেড়, খ. পানকৌড়ি, গ. গয়ার, পানকৌড়ির মতোই মোটামুটি, তবে লম্বা গলা। ছুরির মতো ঠোঁট।

তিন. বকের দল: ক. গোবক, কোঁচবক, ওয়াক, খ. মানিকজোড়, হাড়গিলা, সোনাজঙ্ঘা, গ. কাস্তেচরা, খুন্তে বক, ঘ. কানঠুঁটি।

চার. হাঁসের দল: ক. যাযাবর—গোলাপসির, নীলসির, ডুবুরিহাঁস, খুন্তেহাঁস, ভুতিহাঁস, গিরিয়াহাঁস, দিঘৌচ, নাকহাঁস, চখাচখি, ডোরাশির, বালিহাঁস ও শরাল, খ. পোষা—রাজহাঁস ও নানারংয়ের পাতিহাঁস।

পাঁচ. শিকারী পাখির দল: ক. শকুন—শাদা শকুন, গৃধিনী, রাজশকুন, খ. চিল—শঙ্খচিল, মাঠচিল, গ. বাজ—তিলেবাজ, শাহবাজ, শিকরা, গরুড় বাজ।

ছয়. মোরগের দল: ক. ময়ূর, খ. বনমোরগ, গ. বটের, ঘ. তিতির।

সাত. ঝিলের পাখির দল—ক. সারস, খ. ডোমকুর।

আট. জলের ধারের পাখি দল: ক. জলপিপি, খ. ডাহুক, গ কাদাখোঁচা, ঘ. গাংচিল।

নয়. পায়রার দল: ক. পায়রা—হরিয়াল, গোলাপায়রা, খ. ঘুঘু—রাজঘুঘু, লালঘুঘু, তিলেঘুঘু, কণ্ঠীঘুঘু, গ. ভাট তিতির।

দশ. টিয়ার দল: ক. টিয়া, খ. চন্দনা, গ. মদনা, ঘ. লটকন।

এগার. কোকিলের দল: ক. কোকিল, খ. পাপিয়া, গ. চাতক।

বার. পেঁচার দল: ক. লক্ষ্মী পেঁচা, খ. হুতোম পেঁচা, গ. কালো পেঁচা, ঘ. কোটরে পেঁচা।

তের. ছেপকা: নরম পালকের রং ফিকে তামাটে, হলুদের উপর কালো ছিট। ঝোপেঝাড়ে, মাটিতে বা গাছের ডালে নিখুঁতভাবে লুকিয়ে থাকতে পারে। ওড়ার সময় পালকের শাদা রং দেখা যায়। দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে। সন্ধ্যায় ও রাতে বেরিয়ে পোকা ধরে খায়। ছোট পা, ছোট ঠোঁট। ঠোঁটের উপর গোঁফ। বড় বড় চোখ।

চৌদ্দ. বাতাসীর দল: ক. বাতাসী, খ. তালচোঁচ, গ. বড় বাতাসী।

পনের. মাছরাঙার দল: ক. মাছরাঙা—শাদাবুক মাছরাঙা, কালোমাথা মাছরাঙা ও ছোট মাছরাঙা, ফটকা বা শাদা-কালো মাছরাঙা, গোঁগা বা তামাটে মাথা মাছরাঙা, খ. হুপো, গ. নীলকণ্ঠ, ঘ. বাঁশপাতি, ঙ. ধনেশ।

ষোল. কাঠঠোকরার দল: ক. বসন্তবৌরী, খ. কাঠঠোকরা।

সতের. ট্রোগোন: গ্রীষ্মমণ্ডলের বাসিন্দা। বেশি দেখা যায় দক্ষিণ আমেরিকায়। চ্যাপ্টা ঠোঁট। উপরের ঠোঁটটি নিচের দিকে বাঁকানো। লেজ লম্বা। নানা রংয়ের রঙিন উজ্জ্বল পালক। পা

ছোট আর কমজোরী। আঙুল দুটি সামনে ও দুটি পেছনে। ট্রোগোন মানে যে খুঁটে খুঁটে খায়।

আঠার. চড়ুই পাখির দল: পায়ের গড়নে সবার এমন মিল যে আঙুল মুড়ে ডাল আঁকড়ে সবাই বসতে পারে। ক. চড়ুই, খ. বাবুই, গ. মুনিয়া, ঘ. তুতি, ঙ. সোনাপাখি, চ. বর্ণালী, ছ. ভারুই, জ. কসাই পাখি, ঝ. ইস্টিকুটুম, ঞ. ফিংগে, ট. ময়না ও শালিক, ঠ. কাক, ড. হাড়িচাচা, ঢ. সাতসয়ালী, ণ. ফটিকজল, ত. বুলবুল, থ. ছাতারে, দ. দুধরাজ, ধ. চাক দোয়েল, ন. ফুটকি, প. পাণ্ডু, ফ. দোয়েল, ব. রামগাংরা, ভ. চোরপাখি, ম. খঞ্জন ও তুলিকা, য. চারসপাখি, র. মৌচুষি, ল. চশমপাখি, শ. টুনটুনি।

স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ জলবায়ু অনেক সময় পাখিদের আকৃতি, পালকের রংকে প্রভাবিত করে। এর ফলে একই প্রজাতির পাখিদের মধ্যেও স্থানভেদে রং ও আকৃতিতে কিছু কিছু পার্থক্যও চোখে পড়ে। লেজ ছাড়া ডুবুরি পাখিদের মধ্যে বিবর্তন হয়েছে সবচাইতে কম। শাখাচারী পাখিদের মধ্যে বিবর্তন হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

জীবজগতে চলছে প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকার জন্যে লড়াই। খাবার সংগ্রহের জন্যে নিরন্তর সংগ্রাম। যোগ্য প্রাণীরা প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করে টিকে থাকে। অন্যরা অবলুপ্ত হয়ে যায়।

জীবজগতে পাখিদের বেঁচে থাকার দুটো বিশেষ কারণ রয়েছে। এক. এরা উড়তে পারে। যার ফলে খাবারের সন্ধানে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। দুই. পাখা চালানোর ফলে তাদের রক্ত 'গরম রক্তে' পরিণত হয়। প্রকৃতির তাপের তারতম্যের সাথে তাদের রক্তের তাপের কোনো তারতম্য ঘটে না। রক্ত গরম হবার ফলে বেঁচে থাকার সুবিধা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পাখা চালনার সাথে সাথে পাখিদের হৃৎপিণ্ড বেশ

শক্তিশালী হয়ে ওঠে।) এ-ছাড়াও পাখিদের রয়েছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যা তাদের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে নানাভাবে রক্ষা করে। বেঁচে থাকার বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহকে করে সহজ। পাখির পালক, ঠোঁট, পা ও থাবা তাদের দৃষ্টিশক্তিকে সাহায্য করে। আকাশে উড়তে পারাটাও তাদের জীবনকে করছে বৈশিষ্ট্যময়।

পাখিদের গায়ের পালক তাদের শরীরের তাপকে রক্ষার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। পালক হালকা ও নরম। প্রয়োজনের সময় শক্ত হয়ে যায়। ডিমে তা দেবার জন্যে পালক সুবিধাজনক। (পালকের ডাঁটিগুলো ফাঁপা।)

লেজ ও ডানার পালক লম্বায় সবচাইতে বড়। ডানার পালক দু ধরনের হয়ে থাকে। লম্বা পালকগুলো আঙুলের মতো। ছোটগুলো ডানার হাড়ের ওপর ঘন বিন্যস্ত।

শরীরের মাঝারি ধরনের পালকের নিচে চামড়ার ওপর রয়েছে এক ধরনের সূক্ষ্ম পালক। বেশির ভাগ পালক রঙিন। এই রং পাখির আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের প্রয়োজনে লাগে। পালকের রংয়ের সাথে রং মিলিয়ে অনেক সময় গাছের পাতার আড়ালে তারা আত্মগোপন করে থাকে। পাখিদের বছরে কয়েকবার পালক পরিবর্তন হয়।

ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে ঘটে বিবর্তনের ধারা। এর ফলে বিভিন্নভাবে পাখিদের ঠোঁট, পা ও থাবা রূপান্তরিত হয়েছে।

পাখির ঠোঁট মাথার খুলির সাথে সংযুক্ত। ওপরের ঠোঁটেই তার নাসারন্ধ্র।

যে-সব পাখিরা শস্যদানা আহার করে থাকে তাদের ঠোঁট ছোট তে-কোণা ও শক্ত। ওপর ও নিচের ঠোঁট সমান আয়তনের।

যে-সব পাখি কীট-পতঙ্গ খায় তাদের ঠোঁট সরু সুচালো ও তীক্ষ্ণ। পতঙ্গ ধরার সময় এ ধরনের ঠোঁটকে অনেক সময় চিমটের মতো ব্যবহার করা হয়।

যে সব শিকারী পাখিরা আমিষ-জাতীয় খাবার গ্রহণ করে থাকে তাদের ওপরের ঠোঁট দীর্ঘ বাঁকানো ও শাণিত। নিচের ঠোঁট ছোট কিন্তু শক্ত।

হাঁসদের চ্যাপ্টা ও চওড়া ঠোঁট। সেই ঠোঁটের মধ্যে রয়েছে চিরুনির মতো সব সরু বিভাগ। এর ফলে কাদা ছেঁকে খাবার সংগ্রহ করতে তাদের সুবিধা হয়।

কাঠঠোকরার শক্ত ধারালো ঠোঁট গাছের গুঁড়িতে কোটর বানাতে সাহায্য করে। গাছের বাকলের নিচ থেকে নিপুণভাবে বের করে পতঙ্গ।

পেলিকান বা গগনবেড় পাখিদের বিশাল ঠোঁট মাছ ধরতে উপকারী।

খাবার সংগ্রহ ছাড়াও পাখিরা ঠোঁট দিয়ে আত্মরক্ষা ও বাসা তৈরির উপকরণ সংগ্রহ করে।

ঠোঁটের মতো পাখিদের পা-ও প্রয়োজন অনুযায়ী আকার পেয়েছে। পা দিয়ে অনেক পাখি খাবার হাতড়ায়। আঁচড়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে মুখে তোলে। যে-সব পাখি জলকাদা থেকে খাবার সংগ্রহ করে তাদের পাগুলো লম্বা লম্বা। আঙুলগুলো ফাঁক ফাঁক। যেমন সারস বক, হেরন।

জলচর পাখিদের আঙুলগুলো পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া লাগানো।

পাখিদের চোখের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ। দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পাহাড়ের কণ্ডর শকুন অনেক উঁচু থেকেও নিচের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায়। কণ্ডরের দৃষ্টিক্ষমতা অসাধারণ। এ ছাড়াও শকুন এবং বাজপাখির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। মাছরাঙা পানির নিচে অনেকদূর পর্যন্ত মাছের চলাফেরা দেখতে পাবে।

চোখ

ভোরের আলো ফোটার আগেই পাখিদের ঘুম ভাঙে। আবার সূর্যাস্তের সাথে সাথেই পাখিরা ফিরে আসে বাসায়। দোয়েলের ডাক শোনা যায় খুব ভোর থাকতেই। তারও অনেক পরে শোনা যায় কাকের ডাক।

তবে বকেরা কিন্তু ঠিক বাঁধা নিয়মে চলে। সূর্য উঠলে বাসা ছাড়ে। সূর্য ডুবলে বাসায় ফেরে। আলোর সাথে পাখির খাবার দেখে খুঁজে বের করার সময় বাঁধা। তাকে কেউ খাবার এনে দেয় না। পেঁচা অন্ধকারে ভালো দেখে বলে খাবার খোঁজে রাতে।

আকাশ, মাটি, পানি—সবখানেই খাবার খুঁজতে হয় পাখিদের। তাই তাদের চোখের আকার-আয়তনও বিভিন্ন ধরনের। হাঁসের চোখ চ্যাপ্টা। পানির নিচে যারা খাবার খোঁজে তাদের সবার চোখের গড়নই অমন। চোখের পাতায় ঢাকা থাকে বলে ছোট দেখায় পেঁচা ও বাজের চোখ। আসলে কিন্তু বেশ বড়।

মাথার দু'পাশে দুটো চোখ থাকে পাখিদের। আলাদাভাবে দুপাশের জিনিস তারা দেখতে পায়। অনেক বেশি জায়গা দেখতে পায় পাখিরা। ডাহুক, দোয়েল, বুলবুলি, শালিক, কাকের চোখ এড়িয়ে যাওয়া তাই খুব মুশকিল। একটি জিনিসেই মনোযোগী হবার জন্য তারা মাথা ঘুরিয়ে একচোখে জিনিসটা ভালো করে দেখে। এই কারণেও মাথা নাড়া বা ঘোরাতে হয় তাদের। কিন্তু দরকার পড়লে মুহূর্তে পাখিরা কাছ থেকে দূরে নজর ফেরাতে পারে।

পেচার চোখ দুটো সামনে। তারা দুই চোখে একই জিনিস দেখতে পায়। পাখিদের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ যা দেখা যায় তার একটি উপাদান চোখ। পাখির চোখ মাংসপেশীর সমন্বয়ে গঠিত, সে কারণে সংজ্ঞাবহ কোষের কাজ করে।

এরকম আর কোন প্রাণীর নেই। চোখের এ ক্ষমতা যদি না থাকতো তাহলে এমন করে তারা উড়তে পারতো না। শকুন মাইল খানেক উঁচুতে উড়ে খাবার খুঁজতে থাকে। শিকারীবাজ ক্ষেত বা মাঠের উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে দেখে নেয় কোথায় আছে ছোট্ট মেঠো ইঁদুর। গাছের ডালে বসে পাতার আড়ালে ক্ষুদ্রতম পোকা খুঁজে বের করে দোয়েল।

পাখি বহুদূরের জিনিস মানুষের চাইতে বহুগুণে পরিষ্কার দেখে। কাছের জিনিসও স্পষ্টভাবে দেখতে পায়। যে চোখ দিয়ে দূরে থাকা সাক্ষাৎ যম শিকারীবাজকে লক্ষ্য করছে ছোট পাখিটা মুহূর্তের মধ্যে সেই চোখের ফোকাস বদলে নিয়ে আসে চঞ্চুর ইঞ্চিখানেক দূরে একটা ক্ষুদ্রতম পোকা বা পোকার ডিমের দিকে। এতে প্রমাণিত হয় এদের চোখের অদ্ভুত গঠন ও তার মাংসপেশীর কলাকৌশল। একই চোখ দিয়ে দূরবীন ও বিবর্ধক কাচের (ম্যাগনিফাইং গ্লাস) কাজ দুই-ই হয়। মাংসপেশীর এমন গঠনশক্তি যে দূরবীক্ষণের কাজ করতে করতে প্রয়োজন বোধে মুহূর্তের মধ্যে বিবর্ধক কাচে পরিণত করতে পারে। একমাত্র পেঁচা ছাড়া যাদের চোখ সামনে ও পাশাপাশি। আর সকলের চোখ মাথার দুপাশে। এর ফলে প্রত্যেকটি চোখের দৃষ্টিক্ষেত্র বহুদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত। মাথা নিচু করে শালিক যখন কিছুর আশায় থাকে তখন মনে হয় কিছু যেন শুনছে। কিন্তু আসলে তা নয়। সে এক চোখে দেখছে ঘাসের তলায় ছোট পোকাটি কিভাবে নড়ছে। দু চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে যখন আনে তখনই দু চোখ এক হয়ে কাজ করে। আবার কাদাখোঁচা-জাতীয় পাখির গঠন এমন যে কাদার মধ্যে চঞ্চু ডুবিয়েও সম্পূর্ণ পেছন দিক দেখতে পায় কোন শত্রুর আগমন ঘটছে কি না।

পেঁচার চোখ পাশাপাশি হলেও তাদের চোখে দূরবীনের কাজ সবচেয়ে ভালো হয়। আর ভালো দূরবীনের চোখ মাংসাশী শিকারী পাখিদের।

বাজ বা ঈগলের বহু উঁচু থেকে লক্ষ্য শিকারের উপর ঝড়ের গতিতে নেমে আসার সময় দূরত্বের অনুপাতে চোখের লেন্স সাথে সাথে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এতে লক্ষ্য বস্তু ফসকে যায় না। পানকৌড়ি বা গয়ার যখন পানির তলায় মাছের পেছনে ছোটে তখন পানির ভেতর স্পষ্ট দেখতে তাদের কিছুমাত্র অসুবিধে হয় না।

পাখিদের শোনা

প্রায় ৯000 প্রজাতির পাখি আছে পৃথিবীতে। ৫ সেন্টিমিটারের ছোট্ট মৌচুষি পাখি থেকে শুরু করে ২.৫ মিটারের বড় অস্ট্রিচ এই পাখির গোষ্ঠীভুক্ত। অন্য সমস্ত স্তন্যপায়ী জন্তুর মতো পাখিও মেরুদণ্ডী। কিন্তু স্তন্যপায়ী জন্তুর সাথে পাখির পার্থক্য হলো স্তন্যপায়ীরা ডিম পাড়ে না। পাখি ডিম পাড়ে। পাখিদের ডানা, পাখা, ঠোঁট আছে।

পাখিদের দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। কিন্তু ঘ্রাণশক্তি বেশ দুর্বল। পাখিদের কোন দাঁত থাকে না। এরা 'এভস' শ্রেণীর উষ্ণ রক্তের প্রাণী।

বিজ্ঞানীদের মতে, পাখিদের শ্রবণশক্তি অনেকটা মানুষের মতো। পাখিদের শোনার জন্যে দুটো কান রয়েছে। এদের কানের বাইরের অংশে একটি ছোট নালির মতো থাকে। মাথার পাশে কানের উপরের অংশ পালক ও লোমে ঢাকা থাকে। পাখিদের কানের চারপাশে চামড়ার গোলাকার মাংসপেশী রয়েছে। এটি কানের ছিদ্র মুখটিকে আংশিক বা পূর্ণভাবে বন্ধ রাখতে সাহায্য করে। পর্দার ঝিল্লিটি কানের বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে। এই ঝিল্লির ভেতর দিকের তলে স্পর্শী তন্ত্রিকা থাকে। এটি শব্দকে পৌঁছে দেয়। পাখিরা তাদের এই বিশেষ শ্রবণক্ষমতার সাহায্যে শত্রু অথবা অন্য বিপদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে। নিজেদের সঙ্গী-সাথীরা বিচিত্রভাবে ডাকলে

তা শুনে সাড়া দিতে পারে। আর পেঁচা তো শব্দ শুনেই পৌঁছে যায় তার শিকারের কাছে।

পাখির শ্রবণক্ষমতা ১০০ থেকে ১২, ৮০০ এইচ জেট কম্পনাঙ্ক পর্যন্ত। পাখিদের একটি বিশেষ শ্রবণক্ষমতা আছে। মানুষের কানে যে ধ্বনি অবিরাম মনে হয় পাখিরা তা পৃথক করে শুনতে পারে।

পাখিদের শোনার ক্ষমতাও যথেষ্ট তীক্ষ্ণ। শত্রুর আগমনের শব্দ সহজেই অনুভব করতে পারে। নিঝুম বনভূমিতে যে শত্রু নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে থাকে তাদের হাত থেকে সহজেই তারা আত্মরক্ষা করতে পারে।

কান

পাখিদের কান দেখতে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতো নয়। আমাদের কানের ফুটোর উপর পাতার মতো পাখির কানের পাতা নেই। পাখির কানের ফুটো হালকা পালক দিয়ে আবৃত। পাখিরা ইচ্ছা করলে কানের পালকগুলো একটু তুলে মনোযোগ দিয়ে শব্দ শুনতে পারে। দেখার ক্ষমতার মতো শোনার ক্ষমতাও পাখিদের বেশ তীক্ষ্ণ। আর শব্দের তারতম্য খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে। পেঁচা মিশমিশে অন্ধকারে শুধু শব্দ শুনেই শিকার ধরতে পারে।

তালচোঁচ বা হাওয়াশীল পাখি গুহার ভেতর থাকে। অথচ কেউ কাউকে ধাক্কা না দিয়ে অন্ধকার গুহার দেয়ালে ঠোক্কর না খেয়ে ভেতরে বাইরে আসা যাওয়া করে। এটি সম্ভব হয় ওরা ডেকে ডেকে চলাফেরা করে বলে। শুধু চোখে দেখে এমন করে ওড়া যায় না। তাদের শোনার ক্ষমতা এমনি যে সামনে বাধা পেয়ে ফিরে আসা শব্দ এরা শুনতে পায় সঙ্গে সঙ্গে। তখুনি দিক ঠিক করে উড়ে বেড়াতে কোনো অসুবিধা হয় না।

সব পাখিদেরই কিছু না কিছু শোনার বিশেষ ক্ষমতা আছে। যা তাদের জীবন ধারণে সাহায্য করে।

পাখির উড়তে শেখা

লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর আকাশে এ-ভাবে একটাও পাখি উড়ে বেড়াতো না। এক ধরনের চার-পেয়ে জন্তু ছিলো। পতঙ্গ ছিলো তাদের প্রিয় খাদ্য। এরা পতঙ্গ ধরার জন্যে প্রচণ্ড বেগে ছুটে ধাওয়া করতো। এবং লাফ দিয়ে ধরে ফেলতো পতঙ্গ। এদের পেছনের পা দুটো সামনের পা বা হাতের তুলনায় ছিলো বেশ লম্বা। ছোটার সময় সামনের হাত দুটো দু পাশে ছড়ানো থাকতো। ছুটে চলতো পেছনের লম্বা পা দুটো দিয়ে। ক্রমে বিবর্তনের ফলে সামনের হাতে বড় বড় পালক গজাতে লাগলো। আর আগের মতো ছুটতে গিয়ে বাতাসের ধাক্কায় আকাশে ভেসে উঠলো। এ-ভাবেই পৃথিবীর প্রথম পাখিরা উড়তে শেখে।

কিছুদিন আগে আবিষ্কৃত হয়েছে আরকিওপটেরিক্স নামক প্রাগৈতিহাসিক প্রাক্-পক্ষীর ফসিল। এই ফসিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী জন অস্ট্রোম পাখিদের ওড়া শেখার এই তত্ত্বটি খাড়া করেছেন।

পাখিদের ওড়া

আহারের জন্যে পাখিরা দূর দূর এলাকায় উড়ে যেতে পারে। অনায়াসেই পেরিয়ে যায় বিশাল পাহাড় কিংবা উত্তাল সমুদ্র। পাখিদের বেশির ভাগই চেষ্টা করতো তাদের পাখনাকে সবল করতে। এর ফলে বেড়ে যাবে ওড়ার গতি। কিন্তু অনেক পাখি পেয়ে গেলো প্রচুর খাবার। তাদের হতে হলো না তেমন কোনো শত্রুর সম্মুখীন। ফলে পাখার

কাজও তেমন বেশি করতে হয়নি। এর ফলে তাদের শরীর ক্রমশ বেশ ভারি আর বড় হয়ে উঠতে লাগলো। ধীরে ধীরে পাখার ব্যবহার হারিয়ে ফেললো তারা। এ-সব পাখির পা হয়েছে ভীষণ শক্তিশালী। তাই এরা দৌড়াতে পটু। উটপাখি, ক্যাশেওয়ারী, এমু, অস্ট্রিচ কিংবা গৃহপালিত হাঁস-মুরগী হলো উড়তে না পারার দলের।

কেমন করে ওড়ে পাখিরা ?

নৌকা চালাবার সময় দাঁড় বাওয়ার সাথে এর মিল রয়েছে। দাঁড়গুলোকে পানির স্রোতে পেছনের দিকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে চলার গতিবেগ সৃষ্টি করতে হয়। পাখিরাও ওপরে-নিচে ডানার ঝাপটা দিয়ে এগিয়ে চলে। ওপরে-নিচে পাখা সঞ্চালনের মাধ্যমে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পালক-গুলোকে মুচড়ে দিয়ে বাতাসকে পেছন দিকে ঠেলে দেয়। এ-ভাবে বাতাস কেটে এগিয়ে চলে। লেজকে আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে বিভিন্নভাবে দিক পরিবর্তনে তাদের লেজকে ব্যবহার করে। যেমন করে হালের সাহায্যে নৌকার দিক পরিবর্তন করা হয়।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর পাখি বিভিন্নভাবে ওড়ে। কেউ ওড়ে আকাশের বুকে ঢেউ তুলে। কেউ ওড়ে সমান্তরালভাবে।

বাজ, ঈগল. কাক, চিল, শকুন, পানকৌড়ি ইত্যাদি পাখিরা অনেকক্ষণ ডানা ঝাপটা না দিয়ে মুক্তপক্ষে ভেসে যেতে পারে।

যাযাবর পাখিরা ওড়ে ঝাঁক বেঁধে। (ঝাঁক বেঁধে ওড়া ঐ শ্রেণীর পাখিদের পক্ষে অনেক সোজা। আর এতে উড়তেও পারে তাড়াতাড়ি। দেখা গেছে কোনো দলে যদি পঁচিশটি পাখি থাকে এবং তারা যদি ইংরেজী ভি-আকারে দল বেঁধে ওড়ে তবে তাদের গতিবেগ শতকরা সত্তর ভাগ বেড়ে যায়। এর মানে একটি পাখি যদি ঘণ্টায় দশ মাইল যায় তবে ভি আকারের দলে উড়ে সে ঘণ্টায় যেতে পারবে সতেরো মাইল। কারণ এ-ভাবে দল বাঁধলে বাতাসের স্রোতকে অনেকটা কাজে লাগান যায়।)

পাখির ওড়ার ক্ষমতা অনেক পরিমাণে তার ডানার দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভরশীল।

সবচাইতে দ্রুতগামী পাখি হলো পেরিগ্রিন নামের বাজ পাখি।) শিকার ধরবার সময় তারা উল্কার বেগে নিচু দিকে ছোঁ মারার ভঙ্গিতে ছুটে যায়। তখন তাদের (গতিবেগ হয় ঘণ্টায় প্রায় ২৮০ মাইল।)

কতো উঁচুতে উড়তে পারে পাখিরা ? ১৯২১ সালে এভারেস্ট অভিযান-কারী বৃটিশ দলের সদস্য ডাক্তার ওলাস্টেন প্রায় পঁচিশ হাজার ফুট উঁচুতে একটি শকুনকে দেখতে পেয়েছিলেন। একজন বিশেষজ্ঞ বক ও সারস পাখিদের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কুড়ি হাজার ফুট উপরে হিমালয় পার হয়ে উড়ে যেতে দেখেছেন। ১৯৬২ সালে একুশ হাজার ফুট উচেচ একটি মার্কিন বিমানের সঙ্গে একটি বুনোহাঁসের ধাক্কা লেগেছিলো।

পৃথিবীর সবচাইতে ছোট পাখি হলো হামিং-গোষ্ঠীর মধুচোষা পাখি। এরা ওড়বার সময় এতো দ্রুতবেগে পাখা ঝাপটাতে থাকে যে তা থেকে গুন গুন করে শব্দ হয়। এদের (গতিবেগ ঘণ্টায় পঞ্চাশ থেকে ষাট মাইল।) এদের রয়েছে একটি বিশেষ ক্ষমতা। (পাখিদের মধ্যে এরাই পেছনের দিকে উড়তে পারে।) প্রয়োজন হলে শূন্যে একই স্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারে।)

সমুদ্রের অ্যালবাট্রস পাখির ডানা সব চাইতে দীর্ঘ। তাদের ডানা একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত পর্যন্ত এগার ফুট।

হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের অনেক পাখি জানতো যে পৃথিবী গোলাকার। দক্ষিণ মেরু এলাকার পাখি অ্যালবাট্রস পশ্চিমা বাতাসে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বিরামহীন পুব দিক উড়ে দীর্ঘ দিন পর আবার একই জায়গায় ডিম পাড়তে ফিরে আসে।

উত্তর আমেরিকার রকি পাহাড়ে বাসা বাঁধে ঈগল পাখি। ডিম পাড়ার পর ঈগলরা আমেরিকার স্থলভাগ অতিক্রম করে আটলান্টিক সাগর দিয়ে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ইউরোপ, রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে আবার সেই রকি পাহাড়েই ফিরে আসে।

কিছু পাখি আছে যারা রাতের বেলায় শিকারের খোঁজে বের হয়। যেমন পেঁচা। এরা নিশাচর পাখি। পেঁচার বিরাট চোখ রাতের বেলা ভালো দেখে। আর নরম পালকে কোনো শব্দ হয় না বলে ওড়বার জন্যে খুব সুবিধে।

পাখি ডাকে নানা সুরে। বিভিন্ন ধরনের ডাক তাদের। মানুষ এই ডাক শুনে আকৃষ্ট।

বৃটিশ পাখি বিজ্ঞানী মিস্টার টার্নবুল পাখির ডাককে ১১ ভাগে ভাগ করেছেন।

১. দরাজ গলায় স্বাভাবিক ডাক
২. ছোট ছোট কলি ভাঁজা
৩. বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে ডাক
৪. নিজেদের মধ্যে কিচির-মিচির আলাপ-প্রলাপ
৫. পরস্পরকে আহ্বান
৬. পাখা মেলার বা ওড়বার ডাক
৭. প্রণয়-সম্ভাষণ
৮. আতংকের ডাক বা চিৎকার
৯. ক্ষোভ ও ক্রোধের প্রকাশ
১০. বাচ্চাদের খাওয়ানোর সময় ছেলে ভুলানো ডাক
১১. বেদনা ও দুঃখের ডাক

বেশির ভাগ পাখি নির্জনতা ও গোপনতা প্রিয়।

আমাদের এই উপমহাদেশে প্রায় ১২০০ প্রজাতির পাখি দেখা যায়। এদের মধ্যে রয়েছে ৭৫টি গোষ্ঠী ও ২০টি বর্গের পাখি।

এর মধ্যে অনেক প্রজাতির পাখি ক্রমশ বিরল হয়ে যাচ্ছে।

উড়তে পারা বিশাল পাখি

বিশাল আকৃতির উড়তে পারা দুটি পাখির গোষ্ঠী হলো—অ্যালবাট্রস এবং শকুনী। এদের ওজন ১৩.৫ কিলোগ্রাম।

তবে এই দু গোষ্ঠীর মধ্যে সব থেকে বড় ডানাঅলা পাখি হলো 'ভ্রমণকারী অ্যাবাট্রস'। এদের ডানার মাপ ৩.৩ থেকে ৩.৬ মিটার। এরা সামুদ্রিক পাখি। আকাশে ওড়বার আগে কিছুটা দৌড়ে নেয়।

অ্যালবাট্রসের ডানা দুটো সুবিস্তৃত কিন্তু হাল্কা। ঠোঁট লম্বা এবং বেশ ভারি। বিষুবরেখার দক্ষিণ বরাবর বাস করে এরা।

শকুনের ডানার প্রসারিত মাপ অ্যালবাট্রসের মতোই। পৃথিবীতে দুটি প্রজাতির মধ্যে অন্দিজীয় শকুনরা বাস করে দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতাঞ্চলে। আর দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার পাহাড়ী এলাকায় দেখতে পাওয়া যায় ক্যালিফোর্নিয়ার শকুনদের। খাবারের সন্ধানে তারা তাদের বিশাল ডানা মেলে উঁচু আকাশে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে।

সম্রাট বা রাজশকুন দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোতে। এদের ডানার প্রসার দৈর্ঘ্য ২.৭ থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত।

শাদা পেলিক্যানের ডানার বিস্তার ২.৪ থেকে ২.৭ মিটার পর্যন্ত। এরা কানাডার পাখি। এদের দীর্ঘ ঠোঁটের নিচে থলির মতো একটি মাংশল জায়গা আছে। এটি পেলিক্যানের শরীরকে ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করে।

সারস-জাতীয় পাখি বিশালকায় বাস্টার্ড। এদের প্রসারিত ডানার মাপ ২.৭ মিটার। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে এদের বসবাস।

উড়তে পারা বিশাল পাখিদের মধ্যে এর পর আসে আমেরিকার টাকমাথা ঈগল। ডানার মাপ ২.১ থেকে ২.৪ মিটার পর্যন্ত। এর পরের স্থান স্যাণ্ডহিল সারসের। এদের ডানার বিস্তারের দৈর্ঘ্য ১.৮ থেকে ২.১ মিটার।

পাখির দিনলিপি

পাখিরা মুক্ত স্বাধীন হলেও তাদের জীবনেও রয়েছে কিছু বাঁধা ধরা নিয়ম। সেই নিয়ম অনুসারেই পাখিরা বাসা বানায়। ডিম দেয়। বাচ্চাদের বড় করে। গান গায়। উড়ে বেড়ায়। সবকিছুর পেছনে আছে নিয়ম।

ডিম থেকে ফুটে বের হবার পর মা-বাবার কাছেই পাখির কিছু হাবভাব গড়ে ওঠে। যেমন, আপনজনকে চেনা। খাদ্য ও অখাদ্য বুঝতে পারা। বড় হবার সাথে সাথে পাখিসুলভ গুণগুলো ভেততে ভেতরে জন্মাতে থাকে। গান গাওয়া, ওড়া, বাসা বানানো, বিপদ-আপদ ও ভালোমন্দ সম্পর্কে শেখে আশপাশ দেখে। ঘরের কোণে ঝুলঝাড়ুর বাঁশটাকে চড়ুইরা ভয় করে না। ভয় পায় মানুষের হাতে লাঠি দেখে। এটা দেখে শেখার উদাহরণ। ধোপার ঘাটে কাপড় আছড়াবার জোর শব্দকে ভয় পায় না। কিন্তু হঠাৎ টায়ার ফাটার শব্দ শুনে পালায়। এ-ভাবেই পাখির হাবভাব চালচলন গড়ে ওঠে। এবং নিয়ম বেঁধেই তারা তাদের জীবনযাপন করে।

খাওয়া-দাওয়া

পাখিদের আকার-আকৃতি অনুযায়ী একেক প্রজাতির খাবার একেক রকমের। পাখিরা তাদের মনমতো খাবার পেয়ে সেই পরিবেশের সাথে মিশে যায়।

পাখিরা বিশেষ খাবারের ভক্ত হতে পারে। কিন্তু মাঝে মাঝে তারা তাদের রুচিরও পরিবর্তন করে। যেমন শস্যদানা চড়ুইয়ের প্রিয় খাদ্য। তবুও মাকড়সা, আরশোলা ও ফড়িংও ধরে খায়।

কাক কিনা খায়। কোনো কিছুতেই তার অরুচি নেই। তবুও মরা আরশোলার দিকে তেমন নজর দেয় না। অন্য পাখির ছানা, এমন কি চামচিকার বাচ্চাও মুখে করে নিয়ে যেতে দেখা যায় কাককে।

পোকার যেমন লুকিয়ে থাকার জায়গার অভাব নেই, পাখিরাও তেমনি সর্বত্রই খুঁজে বেড়ায় পোকাদের। হুদহুদ মাটির তলায় বা ইটের আড়াল থেকে খুঁজে পোকা বের করে। কাঠঠোকরা কখনো গাছ ফুঁকরে গর্তের ভেতর থেকে। চোখগেল খুব সহজেই পোকা বের করে গাছের বাকলের ফাঁক থেকে। এ ব্যাপারে তার ঠোঁট ও জিব খুব কাজের। নীলকণ্ঠ চুপচাপ বসে থাকে উঁচু ডালে। নজর থাকে নিচে। পোকার চলাফেরা খেয়াল করে। পছন্দমতো পোকাটি দেখলেই ঝাপ করে নেমে ঠোঁটে চেপে ধরে। উড়তে উড়তেই পোকা ধরে নিতে পারে কোনো কোনো পাখি। যেমন ফিঙে। বাতাসি উড়তে উড়তেই পানির ওপর থেকে পোকা তুলে নেয়। খঞ্জন মাঠে মাঠে ছোটাছুটি করে পোকা ধরে।

গরু-মোষ যেখানে চড়ে সেখানে দেখা যায় এক রকমের বক। এদের নাম গো-বক। খাবারের খোঁজে এরা গরু-মোষের পেছনে পেছনে চলে। গরু-মোষের পায়ের শব্দে পোকামাকড় প্রাণী ঘাসের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। সেগুলো খায় গো-বকেরা। টুনটুনি পাতায় পাতায় পোকা খোঁজে। দোয়েল ও বুলবুলি সারাদিন মাঠি ও বাগানের পোকা খুঁজে বেড়ায়। বটের পাকা ফলও বুলবুলিকে খেতে দেখা যায়।

পৃথিবীতে পোকাখেকো পাখি প্রায় সবই। যে-সমস্ত পাখি শস্যদানা, যেমন, চাল-গম খায়, তারাও প্রায় সবাই পোকা খেতে অভ্যস্ত।

মুখের উগরানো যে খাবার পাখিরা বাচচা অবস্থায় খায় তা কিন্তু সব সময় নিরামিষ হয় না। অবশ্য পায়রার কথা আলাদা। পায়রা তার ছানাকে যা খাওয়ায় তা হলো তার শরীরের ভেতরকার রস। এই জন্যে এই খাবারকে 'পায়রার দুধ' বলে।

কিছু জাতের পাখি ফুলের মধু খায়। আসলে এরাও কিন্তু পোকাখেকো পাখি। বসন্তকালে যখন গাছে ফুলে ছেয়ে যায় তখন মধুর লোভে শুধু মৌমাছি নয় পাখিরাও ভিড় করে। মৌচুষি পাখি তার বাঁকা সুঁচালো ঠোঁট ফুটিয়ে মধু চুষে খায়। ফুলের মধু দোয়েল-বুলবুলিরও প্রিয় খাবার। ফটিকজল, টুনটুনি, ছাতারে প্রভৃতি পাখিও মধু খেতে আসে এ-সময়। কোনো কোনো পাখি আবার খেতে পছন্দ করে ফুলের মধু নয়, ফুলের রেণু।

পুরোপুরি নিরামিষ খাবার খায় কিছু কিছু পাখি। এরা পোকা খায় না। চন্দনা, টিয়ে, মদনা, লটকন এই জাতীয় পাখি। এদের খাবার হলো ফল আর ফুলের বীচি।

কিছু জাতের পাখির খাবার তালিকা আবার একটু অন্য রকম। শ্যাওলা, পানা, শামুক, গুগলি, সাপ, ব্যাঙ, মাছ, পোকা, কাঁকড়া ইত্যাদি। এগুলো কাদাখোঁচা পাখি নদীর ধারে ডাঙার উপর ছুটে ছুটে ধরে খায়। পানির কিনারায় বসে থেকে মেছো-বক ধরে খায় মাছ। মাছরাঙার মাছ ধরার কায়দা আবার চমৎকার। উঁচু জায়গায় বসে থাকবে চুপচাপ। নজর পানির দিকে। সুযোগ বুঝে হঠাৎ ঝপ করে পানিতে লাফিয়ে পড়ে মাছটি চেপে ধরবে ঠোঁটে। উঠে এসে নিজের জায়গায় বসে খাবে মজা করে। শাদা কালো রংয়ের মাছরাঙারা পানির ওপর অনেকক্ষণ উড়ে উড়ে সুযোগ বুঝে মাছ ধরে। পানকৌড়ি আর গয়ার ডুব দিয়ে মাছ ধরে তুলে খায়। কোড়াল আর শঙ্খচিলেরও খাবার মাছ। মাছরাঙার মতো এরাও একইভাবে মাছ ধরে। গগনবেড় মাছ ধরে

ঝাঁক বেঁধে। তিন দিক ঘিরে ওরা মাছের ঝাঁক তাড়িয়ে নিয়ে আসে। ডান ঝাপটায় পানির ভেতরে। মুখের কাছে এলেই হাঁ করে যতোটা পারে মাছ তুলে নেয়ে। ঠোঁটের নিচের খলেটা বড় হাতার মতো কাজ করে। শামুকখোল বা ঝিনুকখোলের প্রধান খাবার শামুক আর ঝিনুক। বুনোহাঁসের ঝাঁক ও দল বেঁধে খেতে নামে পানিতে। বালি-হাঁস, বাদিহাঁস, ডোরাশির, মরাল, গিরিয়াহাঁস, ভূতিহাঁস পোকা, শামুক, সাপ, কেঁচো,—কিছু বাদ দেয় না খেতে।

পেঁচা রাতের অন্ধকারে খাবারের খোঁজে বের হয়। অন্ধকারে ভালো দেখতে পায় পেঁচা। লক্ষ্মী পেঁচার প্রিয় খাবার হলো ইঁদুর। কিন্তু হুতোম পেঁচা ও কালো পেঁচা ইঁদুর ছাড়াও সাপ, গিরগিটি, ব্যাঙ, কাঁকড়া এমন কি ছোট পাখিও ধরে খায়। তবে কোটর পেঁচা ও জংলী পেঁচার প্রধান খাদ্য হলো পোকা।

শকুনের প্রিয় খাবার মৃতদেহ। আকাশের অনেক উঁচুতে উড়ে এরা খাবার খোঁজে। পেয়ে গেলেই ঝাঁক বেঁধে সেখানে নেমে আসতে বেশি সময় লাগে না। ভাগ করে ছিঁড়ে-খুঁড়ে অতিকায় প্রাণীর মৃতদেহ খেয়ে শেষ করতে এদের দেরি হয় না একটুও।

পাখির নিজেকে ঠোকরানো

পাখি তার ঠোঁট দিয়ে নিজের পালক ঠোকরায়। গায়ে পালক গজানোর সাথে সাথে নিজের শরীরকে ঠোকরাবার অভ্যেস গড়ে উঠে। এতে পাখিদের গায়ে জোর বাড়ে।

পাখি ঠোকরানোর মাধ্যমে পালক পরিষ্কার করে। পালক নরম করে। পাখির শরীরে ও পাখার তলায় স্নেহ পদার্থের গ্রন্থি আছে ঠিক লেজ বরাবর। ঠোকরানোর ফলে এই গ্রন্থিগুলো থেকে তেল বের হয়ে পালকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে পালক পরিষ্কার তো হয়ই

তার পাশাপাশি চকচকেও হয়ে ওঠে। পালকে তেল থাকার ফলে পানিতে ভেজে না। যতোই পানি পড়ুক একবার নাড়া দিলে সব পড়ে যায়।

মূলত পালক পরিষ্কার করতেই পাখিরা এ-ভাবে নিজেদের ঠোকরায়। কতকগুলো পাখি আবার পানি দিয়েও পালক পরিষ্কার করে। হাঁস এ ধরনের পাখি। পানিতে ডুবে ডুবে পালক ধুয়ে নেয়। জাপানের এক ধরনের লম্বা লেজঅলা' মোরগকে বেশ কষ্ট করতে হয় তার লম্বা পালক সাফ করতে।

পাখির নাচ-গান

পাখিরা নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে ডাকে শব্দ করে। আর গান করে শিস দিয়ে। এগুলো পাখিদের ভাবের প্রকাশ।

কোনো কোনো পাখির অঙ্গভঙ্গির ভেতরে বিশেষ ধরনের ছন্দ থাকে। আর এটাই হলো পাখির নাচ। যে পাখি ভালো গাইতে পারে না তারাই নাকি বেশি অঙ্গভঙ্গি করতে পারে।

ময়ূরের নাচের ভঙ্গি বেশ মনোরম। পুরো পেখম ছড়িয়ে এক পা তুলে ও নামিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে নাচে। মাথা নিচু করে ডানা দুটো দিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে যায়। চড়ুইকে ডানা ছড়িয়ে বুক নিচু করে নাচতে দেখা যায়। মুখ তুলে চিপ চিপ শব্দ করে তখন একবার এদিকে একবার ওদিক ডানা আর লেজ কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ঘুরিয়ে নেয় খানিকক্ষণ। চড়ুইয়ের নাচের ভঙ্গির মতোই তিতিরের নাচের ভঙ্গি। কিন্তু দুই মোরগের দেখা হলে নাচের ভঙ্গি অন্য রকম। গলা তুলে পালক ফুলিয়ে তারা লাফিয়ে ওঠে। এ ধরনের নাচকে নাচ না বলে লড়াই-ই বলা উচিত।

পাখিরা তাদের নাচ ও গানের মাধ্যমে সাথীদের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করে। নাচ ও গান গাওয়া পুরুষ পাখিদেরই এক-চেটিয়া। নাচও নয় গানও নয় মনের ভাব জানাতে কাঠঠোকরা শুকনো কাঠ ঠোঁটে ঠুকে ঠুকে শব্দ করে। ঘুঘু, পায়রা গলা ফুলিয়ে একটানা একঘেয়ে ডেকে যায়। বসন্ত বাউরি টুক টুক হাতুড়ি ঠোকার মতো শব্দ করে মুখে। উঁচু ডালে একা বসে কাঁপা কাঁপা মিহি সুরে ডাকে শাদা বুক মাছরাঙা। শঙ্খচিল মগডালে বসে ভাঙা গলায় চিল-ডাক ডাকে।

পাখিদের ডাকের হয়তো অর্থ দেয়া যাবে না মানুষের ভাষায়। তবে এদের ডাকেরও কিছু অর্থ আছে। ভয়ের ডাক, খুশির ডাক ছাড়াও নিজের নিজের এলাকা পাখিরা বুঝিয়ে দেয়ে ডাকের মাধ্যমে।

বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ ধরনের ডাক ডাকে পাখিরা। ওড়ার সময়, খাবার সময়, একা বসে, দল বেঁধে, এমনকি নতুন কিছু দেখলেও তাদের ডাকের রকমফের হয়ে যায়। এ থেকে বোঝা যায় পাখিরা দুজনের মধ্যে, দলের মধ্যে এবং ভিন্ন জাতের পাখির সাথে ডাক দিয়ে ভাব আদান-প্রদান করে থাকে।

পাখির বাসা

পাখিরা ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। তাই তাদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে বাঁধতে হয় নীড়। সুবিধেজনক জায়গা বেছে, উপকরণ জমিয়ে তারা শুরু করে নীড় বাঁধার কাজ। বিভিন্ন ধরনের পাখির বিভিন্ন ধরনের বাসা।

অনেক পাখি আছে যারা বাসা বাঁধার আগে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসে। বিচিত্র কৌশল খাটিয়ে বাসা বানাবার কাজ চলে। শত্রুর দৃষ্টি থেকে বাসাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে চাই উপযুক্ত আচ্ছাদন। যাতে

শত্রু এসে নীড় থেকে ছানাদের খেয়ে না ফেলে। চাই বাসা বানাবার উপকরণ। বাসা বানাবার কাজের মধ্য দিয়ে পাখিদের বুদ্ধি এবং দক্ষতার চমৎকার পরিচয় মেলে। অনেক বাসা নির্মাণে ফুটে ওঠে শিল্পী মনের পরিচয়। যেমন বাবুই পাখির বাসা। কুশলী দক্ষতার স্পর্শ।

খাবার যখন সহজলভ্য হয় এবং পরিবেশ যখন অনুকূল হয়ে ওঠে সে রকম সময় বুঝে প্রতিটি প্রজাতি তাদের ডিম পাড়ার সময় নির্বাচন করে। এমন অনেক ধরনের পাখি আছে যারা অনুকূল আবহাওয়া না পেলে সে বছর ডিম পাড়ে না।

পাকিস্তানের কচ্ছ এলাকা হলো ফ্লেমিংগো পাখিদের বিশাল উপনিবেশ। লাখ লাখ পাখি এসে জমা হয় সেখানে। বর্ষার ঠিক পর পরই ফ্লেমিংগোরা সেখানে কাদামাটির বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে। কিন্তু যে বছর অতিবৃষ্টি হয় কিংবা কম হয় অর্থাৎ আবহাওয়া পছন্দমতো হয় না, তখন তারা ডিম পাড়া বন্ধ করে দেয়। এ থেকেই বোঝা যায় পাখিদের স্বভাব কতো বিচিত্র এবং স্পর্শকাতর।

বাসা বাঁধার আগে পাখিরা ভালো করে লক্ষ্য করে সেখানে খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাবে কি না। কিংবা এমন দূরত্ব থেকে খাবার নিয়ে আসবে যাতে দিনের আলো ফুরিয়ে যাবার আগেই বাসায় ফেরা সম্ভব। বছরের যে সময়টিতে প্রচুর পরিমাণে খাবার পাওয়া যায়, পাখিরা সেই সময়টি বেছে নেয় বাসা বাঁধার জন্যে।

ডিম পাড়ার সময় হলে পাখি বাসা তৈরি করে। এ-সময় খুবই ব্যস্ত থাকে তারা। সব পাখির বাসা এক রকম নয়। একেক জাতের পাখির বাসা একেক রকম। বাসা তৈরির কৌশল এবং জিনিসপত্রও একই রকম নয়। চড়ুই বাসা বানায় খড়কুটো দিয়ে। কাক বানায় তার আর কাঠি দিয়ে। গাঙচিলের বাসা আবার খুব শাদামাটা। ডিমের

চারপাশে কয়েকটা নুড়ি বা মাটির ঢেলা ঘেরা থাকে হাট্টিমাদের বাসা। হঠাৎ দেখলে বাসায় ডিম আছে বলে মনেই হয় না। মাছরাঙা বাসা বানায় নদী, খাল কিংবা পুকুরের তীরে। পানি থেকে দুই হাত মতো ওপরে সুড়ঙ্গ করে তাতে ডিম দেয় এরা। ঠোঁট দিয়ে মাটি খুঁড়ে পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে মাটি বাইরে এনে ফেলে দেয়। সুড়ঙ্গের শেষে বানায় ডিম দেবার কোটরটি। বাসা বানাতে স্ত্রী-পুরুষ উভয় মাছরাঙাই একসাথে কাজ করে।

বাবুই তার বাসা তৈরি করে ঘাস দিয়ে। ঠোঁট দিয়ে লম্বা ঘাসের পাতা ছিঁড়ে এনে বুনে, ডালে ঝুলিয়ে, বোতলের মতো বাসা বানায়। সাধারণত খেজুর ও তালগাছে এদের বাসা দেখতে পাওয়া যায়। তলা দিয়ে বাসায় ঢোকার পথ থাকে। ডিম যেন না পড়ে যায় তার জন্যে ডিমের কোটরে ঘাসের একটা আলাদা বেড়া দিয়ে দেয়। এদেরকে বুনুনী বা কারিগর পাখি বলা হয় সুন্দর বাসার জন্যে।

টুনটুনি বাসা বানায় পাতায় জুড়ে। সুঁচালো ঠোঁট দিয়ে আগে পাতার ধারে ফুটো করে নেয়। এর পর ফুটোয় লম্বা ঘাস বা লতা ঢুকিয়ে দুটি পাতাকে জুড়ে দেয়। ভেতরে থাকে শুকনো লতাপাতা, তুলো, আঁশ কিম্বা লোমের গদি। আর এর ওপর থাকে ডিম।

গাছের কোটরে, দেয়ালের ফোকরে অনেক পাখি বাসা বানায়। প্যাঁচা ও নীলকণ্ঠ এ দলের পাখি। কাঠঠোকরা পুরনো বা মরা গাছের কোটরে বাসা বানিয়ে ডিম দেয়। চোরপাখি ও ধনেশও বাসা বানাবার জন্যে গাছের কোটর বেছে নেয়।

পানডুবির বাসা ভাসে পানিতে। পানিতেই বাসা বানায় পানডুবি। পানির গাছ, পাতার ডাঁটি, শুকনো পচা পাতা জমিয়ে একটি ভেলার মতো করে তার ওপর ডিম দেয়। একই ধরনের বাসা বানায় জলপিপি।

পাখিরা বাসা বানায়। ডিম পাড়ে। বাচ্চা তোলে। কোনো কোনো পাখির বাসা যেন শিল্পীর ছোঁয়ায় বানানো। আসলে বাসা বানাবার তাগিদ যেমন, কৌশলও জন্মগতভাবেই পেয়ে যায় পাখিরা।

ভারতের মহারাষ্ট্রে এক ধরনের ছোট পাখি, তাই বর্ষাকালে বাসা বাঁধে। যখন ঝড়ো বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপটাতে সে-সব বাসা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। ঐ পাখিদের এ-সময় বাসা বাঁধার কারণ হলো, তখন অজস্র পোকামাকড়, কীট-পতঙ্গ পাওয়া যায়। বর্ষার ভেজা আবহাওয়াতে এ-সব পোকা বেরিয়ে এলে পাখিরা তা খায়।

পাখি বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, কোনো একটি বিশেষ ধরনের পোকা যদি একটি বিশেষ প্রজাতির পাখির প্রিয় খাদ্য হয় তা হলে বছরের ঠিক যে সময়টিতে ঐ পোকারা দেখা দেয় সেই সময়টিই হবে ঐ বিশেষ প্রজাতির পাখিদেরও বাসা বাঁধা আর ডিম পাড়ার সময়।

পাখির বাসা হলো একটি সাময়িক আশ্রয়। সেখানে ডিম পাড়া, ডিম ফোটানো এবং শাবকদের পালন করা হয়। শাবকরা বড় হয়ে উঠলে সেই বাসাটির প্রয়োজন যায় ফুরিয়ে।

পাখিরা হলো সরীসৃপের বংশধর। তাদের পূর্বপুরুষেরা ডিম পাড়তো ঘাস অথবা মাটির ওপর। বাসা বাঁধার স্বভাব তাদের ছিলো না। প্রায় দুশো গোষ্ঠীর কোকিল, কাউ বার্ড, দক্ষিণ আমেরিকার কালো হাঁস, কয়েক জাতের পাখিদের মধ্যে পূর্বপুরুষদের সরীসৃপ অভ্যাসটি রয়ে গেলো। এ-সব পাখিরা বাসা বাঁধার কৌশল আয়ত্ত করতে পারলো না। তারা লক্ষ্য করলো, খোলা প্রান্তরে ডিম না পেড়ে অন্য পাখির বাসায় ডিম পাড়লে তা থেকে বাচ্চা ফোটার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাই লুকিয়ে পরের বাসায় ডিম পাড়ার অভ্যাস হলো তাদের। কোকিল তাই কাকের বাসায় ডিম পেড়ে যায়।

অনেক পুরুষ পাখি বাসা বাঁধার আগে স্ত্রী-পাখিদের আকৃষ্ট করে নানাভাবে। অনেক পাখি পালকের বাহার দেখিয়ে কিংবা বিভিন্ন সুরে ডেকে তাদের সঙ্গিনীদের আকর্ষণ করতে চায়। পুরুষ ফ্ল্যামিংগো পাখির গায়ে তখন দেখা যায় বিশেষ ধরনের পালকের বাহার। এক শ্রেণীর বকের মাথায় আর গলায় দেখা দেয় কমলা রংয়ের ছোপ। পুরনো পালক হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। বিবর্ণ পালক ঝলমলে। বাসা বাঁধার আগে চলে পাখিদের এই সঙ্গী-বাছাই-পর্ব।

সব পাখি ডাঙায় ডিম পাড়ে। অনেক সময় মেরুদেশের পেঙ্গুইনেরা ভাসমান শিলাখণ্ডের ওপর ডিম পাড়ে।

পাখিরা যে ধরনের পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত সেখানেই বাঁধে বাসা। ঈগল উঁচু জায়গায় থাকতে ভালোবাসে। তাই তার বাসা উঁচু খাড়া পাহাড়ের গায়ে। পর্বতচূড়ার কাছাকাছি। সিন্দাবাদের দুঃসাহসিক অভিযানের গল্পে আছে বিশাল রক পাখির বাসা ছিলো দুর্গম পাহাড়-চুড়োতে। সে বাসায় ছিলো অনেক মূল্যবান পাথর।

যে-সব পাখি ভালোবাসে গাছপালা তাদের বাসা থাকে পাতার আড়ালে। তিতির, বটের জাতের পাখি বেশির ভাগ সময় মাটির ওপর ঘুরে বেড়ায়। তাই তারা ডিম পাড়ে মাটির ওপর। পানকৌড়ি, বক—এ-সব জলচর পাখিরা বাসা বাঁধে পানির কাছাকাছি।

দেখা গেছে, বড় বড় পাখিরা দল বেঁধে বাসা তৈরি করে। আর এ-ভাবেই তারা গড়ে তোলে এক একটি উপনিবেশ। ছোট ছোট পাখিদের ঝোঁক এককভাবে বাসা তৈরির দিকে। বড় পাখিরা প্রধানত খাবার সংগ্রহ করে অফুরন্ত খাদ্যের উৎস পানি থেকে। ছোট পাখিরা স্থলভাগ থেকে।

পাখিদের সংসার

ডিম ও ছানা : পাখি বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে। পাখির আকার ও আকৃতি অনুসারে তাদের ডিমেরও রকমফের আছে। বড় পাখির বড় বড় ডিম আর ছোট পাখির ডিম হবে ছোট।

অস্ট্রিচ পাখি যেমন পৃথিবীতে বড় পাখি তেমনি তার ডিম সবচেয়ে বড়। হামিং বার্ড ছোট পাখি, তার ডিমটাও বেশ ছোট। ডিম ফুটে বাচচা বেরোয়। (অনেক জাতের বাচচাদের ডিম থেকে বেরুনোর সময়েই গায়ে পালক থাকে। এ ধরনের ডিম বড় হয়।) আর (ডিম ফুটে বেরুনোর সময় যাদের পালক থাকে না, তাদের ডিম ছোট হয়।)

প্যাঁচার ডিম প্রায় গোলাকার। মাছরাঙা, বাঁশপাতিরও তাই। ওদের ডিম শাদা ও মসৃণ। পানকৌড়ির ডিম লম্বাটে। শাদা। গয়ারের ডিমের রং সবজে নীল। লম্বাটে গড়ন। লাটিমের মতো দেখতে তালচোঁচের ডিম। হাটিমা ও জলপিপিব ডিমও এ ধরনের।

বিভিন্ন পাখির ডিম বিভিন্ন রঙের। বাতাসির ডিম শাদা। হাটিমার ডিমের রং খয়েরি, তাতে কালচে ছোপ। জলপিপির ডিমের রং তামাটে সবুজ।

(যে-সব পাখিরা মাটির গর্তে বা কোটরে ডিম পাড়ে তাদের ডিমের রং হয় শাদা। খোলা জায়গায়, নদীর চরে, কিংবা মেঠো বাসায় যারা ডিম পাড়ে তাদের ডিমে শাদা রংয়ের সাথে অন্য রংয়ের খয়েরি বা কালচে ছোপ থাকে।) কাকের ডিম নীলচে সবুজ। টুনটুনির নীলচে ডিমের ওপর থাকে লাল ফুটকি। ছাতারেও ডিম হয় আকাশী নীল রংয়ের। ফ্যাকাশে হলুদ ডিম ময়ূরের।

বাসা বানায় না এমন পাখিরা হলো চাতক, পাপিয়া, কোকিল। কোকিল ডিম দেয় কাকের বাসায়। কোকিলের ডিম কাকের ডিমের মতো

হলেও তা আকারে ছোট। চাতক আর পাপিয়া ডিম পাড়ে ছাতারে পাখির বাসায়। ছাতারের ডিমের মতো এদের ডিমও নীলচে।

ডিম পাড়া শেষে শুরু হয় তা দেবার পালা। (ডিমের ভেতর ছানাটি তৈরি হয়ে গেলে ডিমের খোলা ফাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তখন তার ওপরের ঠোঁটের ডগায় ছোট্ট শক্ত একটি ডিম-দাঁত থাকে। ডিমের খোসা ভাঙতে এটি বিশেষ সাহায্য করে। ডিম থেকে বেরিয়ে আসার পর ডিম-দাঁতটি মিলিয়ে যায়।)

সব পাখির ছানাই ডিম থেকে ফুটে বেরুবার পর একইভাবে পালকে ঢাকা থাকে না। কোনো কোনো পাখির ছানার গা ঘন পালকে ঢাকা থাকে। এরা ডিম থেকে বেরিয়েই মায়ের সাথে ঘোরাফেরা শুরু করে এবং খুঁটে খুঁটে খাবার খেতে পারে। মোরগ, তিতির এ ধরনের পাখি।

ডিম থেকে বের হয়ে যাদের গায়ে লোম থাকে না বা সামান্য থাকে সে-সব ছানার চোখ ফোটে না। মা-বাবা যত্ন করে ওদের বড় করে তোলে। চিল, বক, চড়ুই, মাছরাঙা, পায়রা, কাক প্রভৃতি এই জাতের পাখি।

ডিম ফুটে বাচচা বেরুনোর পর শুরু হয় সেবা-যত্ন করে বড় করে তোলা। যে ছানা মায়ের সাথে চলতে পাবে না, তারা শুধু বড় হাঁ করতে পারে। তাদের ছেড়ে বাসা থেকে যাওয়া যায় না। পাখিরা ডানা দিয়ে ঢেকে রোদ থেকে পানি, ঠাণ্ডা থেকে ছানাগুলোকে বাঁচায়। এক জন তাদের দেখা-শুনা করে। অন্য জন খুঁজে আনে খাবার। যত্ন করে খাওয়ায়। যতদিন না ছানাগুলোর পালক গজায়, ডানা শক্ত হয়, ততদিন মা-বাবার আদর যত্নে বড় হতে থাকে। পাখিরা ঠোঁটে করে তাদের খাবার এনে খাওয়ায়।

ছানারা ডিম থেকে ফুটেই উড়তে পারে না। মা-বাবার আদর যত্নে বড় হতে হতে গায়ে পালক ওঠে। চোখ ফোটে। চারপাশ সম্পর্কে

একটা কৌতূহল জন্মে। বাইরে আসার জন্যে ছটফট করে বাচচারা। ডানা আর লেজ শক্ত হয়ে যায়। অনেকটা মা-বাবার মতোই বড়-সড় দেখায় তখন।

বাচচাগুলো নিজেদের মধ্যে ঠেলা-ঠেলি, ঠোকরা-ঠুকরি করে। বাসা থেকে পড়ে গিয়ে বিপাকেও পড়ে। বাইরে যাবার ইচ্ছে যেন তাড়িয়ে ফেরে ওদের। বাসার উপরে উঠে বসে থাকে কেউ। কেউ কাছের ডালে বসে। মা-বাবা খাবার নিয়ে এলে ঝাঁপিয়ে গিয়ে তার ঠোঁট থেকে খাবার নিতে শুরু করে। ডানা ঝাপটে অন্য ডালে বসার চেষ্টা করে। এ-ভাবে তাদের ওড়ার কাজ শুরু হয়। প্রথমে এ-ডাল থেকে ও-ডালে। তারপর ডাল থেকে মাটিতে। মাটি থেকে ডালে। কখনো বাসার চারপাশ এক চক্কর ঘুরে আসবে। কিন্তু বাসা ছাড়া হলেও মা-বাবার কাছ ছাড়া হতে চাইবে না কিছু দিন। তাদের সাথেই বাসার কাছাকাছি উড়বে। খাবার খুঁজে নেবে। কখনো ডানা ঝাঁপিয়ে হাঁ করে মা-বাবার কাছে খাবার চাইবে। না পেলে নিজেই খুঁজে পেতে চেষ্টা করবে। এমনি করে নিজে নিজে অনেক কিছু শিখে ফেলে বাচচারা। তার পর একদিন নির্ভয়ে ডানা মেলে আকাশে।

পাখির বাসার সুপ

চীনারা খুব পছন্দ করে এই পাখির বাসার সুপ। ইউরোপের ফিঙে পাখির বংশধর কোল্লোকালিয়া সমুদ্রের খাড়া খাদে তৈরি করে। এই বাসাগুলো সাধারণত পূর্ব এশিয়ার দ্বীপসমূহে দেখা যায়।

এই পাখির মুখের লালা এতো ঘন যে তা দিয়েই বাদামের খোলের মতো বাসা তৈরি করা যায়। তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে লালা জমে শক্ত হয়।

সবুজ আর কালচে রংয়ের এই পাখিরা একেক জন একেকটা বাসায় বাস করে।

বাসা সংগ্রহকারীরা একটা লম্বা লাঠির আগা দিয়ে আলতোভাবে খুঁচিয়ে বাসাটিকে আলগা করে তুলে নিয়ে আসে। পাহাড়ের খাঁজ থেকে এগুলো সংগ্রহ করতে অনেকে লম্বা মাচাও ব্যবহার করে। চীনের বাজারে এ-সমস্ত বাসা কিনতে পাওয়া যায়।

স্যুপ তৈরি করার জন্যে বাসাটি প্রথমে গরম পানিতে ভেজানো হয়। গরম হয়ে গেলে মশলা দিয়ে রাঁধা হয়। খেতে চমৎকার স্বাদ।

নীড়-উপনিবেশ

বক, হেরন, ফ্লেমিংগো, শকুন অথবা সমুদ্রচারী টার্ন, পানকৌড়ি, পাফিন, গানেট প্রভৃতি পাখির নীড়-উপনিবেশ সাধারনত একটি সুবিধাজনক নির্দিষ্ট স্থানে থাকে বছরের পর বছর। অনেক সময় দেখা গেছে বিভিন্ন জাতের অনেকগুলো পাখি মিলে একটি বিশাল উপনিবেশ স্থাপন করেছে। সমুদ্রের তীরে পাহাড়ের পাথরের খাঁজে ও ধাপে এ ধরনের সমুদ্রচারী পাখিদের উপনিবেশ চোখে পড়ে।

প্রাচীন কালের নাবিকদের অনেক বিবরণে এ ধরনের পাখির দ্বীপের কথার উল্লেখ রয়েছে। নীল সমুদ্রের বুকে ঢেউতে ভেসে থাকছে অজস্র পাখি। তাদের শব্দে দ্বীপ মুখরিত। এ-সব পাখির ডিমের জন্যে এবং পাখির ছানাদের স্বাদু মাংসের লোভে অনেক সময় নাবিকেরা দ্বীপে হামলা চালাতো। এ-ভাবে নির্বিচারে ডিম চুরির ফলে কোনো কোনো জাতের পাখি বিরল হয়ে গেছে। এক সময় মরিশাস দ্বীপে দেখতে পাওয়া যেত ডোডো পাখি। ফরাসী নাবিকেরা এই পাখির মাংসের লোভে ব্যাপক হত্যালীলা চালিয়েছে। ফলে ডোডো পাখি পৃথিবীর বুক থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

রাশিয়ার বেরিং উপসাগরের 'আরি পাথর' দ্বীপ হলো এ ধরনের এক উপনিবেশ।) সেটা পাখির এক বিশাল রাজ্য। সেখানে থাকে

ধূসর ডানার বড় বড় সিন্ধু-চিল। লাল ঠোঁটের তপোরক পাখি। শাদা বুকের কাইরা পাখি। সেখানে পাখিদের স্বভাবের বিষয়ে জানার জন্যে নিয়মিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো হয়ে থাকে।

১৯৬৮ সালে একদল পাখি বিজ্ঞানী গিয়েছিলেন সেখানে। তাদের একজনের বিবরণ: "কানে তালা ধরিয়ে দিলো নানা কণ্ঠের বিচিত্র কাকলি। এসেছি আমরা পাখির রাজ্যে। মুহূর্তে আকাশ ভরে গেলো পাখিতে। আর পায়ের কাছে হুটোপুটি করে চারদিকে ছুটে পালাতে লাগলো পাখির ছানারা। তাঁবুর কাছেই এসে থামলো একটা সিন্ধু-চিল। ঘাসের প্রত্যেকটা ঝোপ থেকে, প্রত্যেকটা ফাটল আর গর্ত থেকে আমাদের দিকে চেয়ে দেখছিলো পাখিদের কৌতূহলী সব চোখ।"

সমুদ্রচারী পাখিদের উপনিবেশ খুব ঘিঞ্জি ধরনের হয়ে থাকে। কোনো কোনো সামুদ্রিক পাখি আবার মাটির নিচে গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে।

সীগালদের স্বভাবে দেখা যায় এক ধরনের নিষ্ঠুরতা। মৃত জীব-জন্তুর মাংস কিংবা দুর্বল প্রাণীদের হত্যা করে সীগালরা তাদের মাংস খায়। অনেক সময় নিজেদের নীড়-উপনিবেশে পরস্পরের ডিম আর ছানা চুরি করে। কোনো ছানা মাটিতে পড়ে থাকলে তাকে ঠুকরে ঠুকরে হাড়গোড় ভেঙে মাংসের একটা তাল বানিয়ে গিলে ফেলে।

ঘাস, সমুদ্রে ভেসে আসা উদ্ভিদ, কাঠকুটো ইত্যাদি দিয়ে সীগালরা পাথরের খাঁজে খাঁজে বাসা তৈরি করে। কালো মাথা সীগালদের কেউ কেউ আবার বাসা বাঁধে।

গাঙচিল দল বেঁধে সমুদ্র, হ্রদ এবং নদীর তীরে বালিয়াড়িতে কিংবা উঁচু পাড়ে গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে। কোনো কোনো গোষ্ঠীর গাঙচিল গাছের কোটরেও ডিম পাড়ে।

(পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের) কালো অগনি পাখিরা যৌথভাবে বাসা বানায়। সকলে মিলে একটি বাসা বানিয়ে তার মধ্যে সমবেতভাবে ডিম পাড়ে।

জলচাঁচা পাখিরা বালিয়াড়িতে নীড় উপনিবেশ স্থাপন করে। এ-সব পাখির নিচের ঠোঁটটা উপরের ঠোঁটের চেয়ে লম্বায় অনেকখানি বড়। তার প্রান্তভাগ আবার ছুরির ফলার মতো ধারালো।

প্রেট্রিল জাতীয় সমুদ্রচারী পাখিরা তাদের জীবনের প্রায় সবটাই কাটিয়ে দেয় সমুদ্রের বুকে। এদের বাসা হয় দুর্গম পাহাড় চুড়োতে। অনেক সময় পুরনো গাছের শেকড়ের ফাঁকে।

আমাদের দেশের (সুন্দরবনে) দেখা যায় গগনবেড় বা পেলিকান পাখিদের উপনিবেশ। এদের ঠোঁট বড়। নিচের তলায় বিশাল এক থলি। বুকে হলুদ ছোপ। প্রচণ্ড ক্ষুধা এদের। মাছ খায় প্রচুর।

এদের মাছ ধরার কায়দাটি অভিনব। একদল গগনবেড় একসাথে ডানা ঝাপটে মাছের ঝাঁককে ঘিরে ধরে। তারপর তাড়া করে নিয়ে যায় তীরের কাছাকাছি। সবাই মিলে বিরাট হাঁ করে মাছের ঝাঁকের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারপর প্রচুর মাছ ধরে মুখের থলি বোঝাই করে নেয়।

বড় বড় কাঁকড়া পাতাওলা গাছ এবং তাল ও নারকেল-জাতীয় গাছের মাথায় বাসা বাঁধে এরা। বাসাগুলো দেখলে মনে হবে কোনো রকমে কাঠকুটো জড়ো করে রাখা। কোনো শ্রী ছাঁদ নেই। একটা গাছে পাশাপাশি বেশ কয়েকটি পাখি বাসা বাঁধে। এদের ডিমের রং খড়ির মত শাদা। তা দেবার পর ক্রমশ হয়ে যায় বাদামী।

আরব সাগরের তীরে রয়েছে কচ্ছের রান নামের বিশাল বালিয়াড়ি এলাকা। এই অঞ্চলটি হলো ফ্লেমিংগো পাখিদের এক বিশাল উপনিবেশ।

সেখানে প্রতিবছর অক্টোবর থেকে মার্চের মধ্যে ৫ থেকে ১০ লক্ষ ফ্লেমিংগো এসে জমা হয় ডিম পাড়ার জন্যে। নরম কাদা দিয়ে উঁচু ঢিপির মতো বাসা বানায়। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নরম কাদা যায় শুকিয়ে। বাসাগুলোর উচ্চতা হয় ৩০ সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। বাসার ছাদের কাছাকাছি একটা সমতল চ্যাপটা জায়গাতে থাকে খাঁজ। সেখানে থাকে ডিম। ফ্লেমিংগো বাসার মধ্যে পা মুড়ে ডিমে তা দেয়। কচ্ছের রান এলাকাকে বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর বৃহত্তম ফ্লেমিংগো-নগরী।

বক-জাতীয় পাখিদের মধ্যে এক ধরনের নাম শাদা কাক। এদের শরীরের ওপর দিকটা ছাই রংয়ের। মাথা আর গলার রং শাদা। মাথার দিকে ঝোলানো কালো রংয়ের লম্বা ঝুঁটি। বুকের কাছে কালো দাগ দেয়া শাদা পালকের সারি। এরা কাঠিকুটি দিয়ে মাচার মতো বাসা বানায়। এদের বাসার মাঝখানটা একটু গভীর হয়। তাতে থাকে ঘাসের আস্তরণ। জলাভূমির আশেপাশের গাছেই এদের বাসা দেখতে পাওয়া যায়।

শাদা ইগ্রেট নামের পাখিটি ভালোবাসে একাকী থাকতে। ডিম পাড়ার সময় হলে এদের পিঠের ওপর সুন্দর পালক গজায়। এই শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপ আর আমেরিকার ফ্যাশনপ্রিয় মহিলারা তাদের টুপিতে এই বাহারী পালক লাগাতে পছন্দ করতো। এই পালক সংগ্রহের জন্যে লোভী শিকারীরা ঝাঁকে ঝাঁকে এ ধরনের পাখি হত্যা করলো। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যাতে পাখিটি অবলুপ্ত হবে যাচ্ছিলো। তখন বুনো পাখির পালক আমদানি-রপ্তানির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

হেরন ও বক-জাতীয় পাখিরা একসাথে থাকতে পছন্দ করে। তাদের এই মিলেমিশে থাকার মধ্যে রয়েছে শৃঙ্খলা। অনেক সময় একই স্থানে কয়েক শতাব্দী ধরে তারা বাসা নির্মাণ করে। অনেক জায়গায় রয়েছে এমন বক-উপনিবেশ।

পানডুবী হাঁস পানির ওপর বা কিছুটা পানিতে ডোবা গাছপালার ওপরে নরম ঘাসের আস্তরণ বিছিয়ে বাসা বানায়। এই পাখিরা প্রত্যেক বার বাসা থেকে বের হবার সময় ডিমগুলোকে ভেজা ঘাসের নিচে চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখে যায়।

সব জাতের পানকৌড়িরা পানির ধারের গাছে কাঠকুটো দিয়ে অগভীর পাটাতনের ধরনে বাসা বানায়।

সোনাজংঘা পাখি আকারে শকুনের মতো। জলাভূমিতে ওদের দলবেঁধে ঘুরতে দেখা যায় মাছ বা ব্যাঙের খোঁজে। লম্বা লম্বা কাঠি দিয়ে মাচার মতো বাসা বানায়। বাসার মাঝখানের অংশটা একটু গভীর করে সেখানে বিছিয়ে দেয় জলজ উদ্ভিদের পাতা আর ডাঁটা। একই গাছে থাকে বারো-তেরোটি বাসা।

শামুকখোল পাখি বাসা বানায় গোলাকার মাচার মতো। এদের প্রিয় খাবার বড় শামুক।

কালো কাস্তেচরা পাখিদের বাসা দেখতে অনেকটা বড় বাটির মতো। কাঠকুটো দিয়ে বাসা বানিয়ে তার মধ্যে বিছিয়ে দেয় খড় আর পালকের আস্তরণ। বড় গাছের মগডালে বাসা বানায় এরা। অনেক সময় ঈগল বা শকুনের পুরনো ফেলে যাওয়া বাসা ওরা দখল করে নেয়।

রাজহাঁসেরা বাসা বাঁধে অনেক উঁচুতে কোনো হ্রদের তীরে। তিব্বতের লাদাখ অঞ্চলে রয়েছে রাজহাঁসদের জন্মভূমি। তিব্বতের বৌদ্ধরা খুব শান্তিপ্রিয়। তারা এই পাখিদের জীবনে কোনো উপদ্রব করে না। শান্ত নির্জন হ্রদের তীরে নরম ঘাসের চাপড়ার ওপর বাসা বানিয়ে থাকে তারা। এদের বাসা একটু গর্তের মতো। সরস গাছগাছড়া দিয়ে গড়া।

প্রতিটি পাখির বাসা বাঁধার রীতি ও কৌশল আলাদা। বাসা বাঁধা, ডিম পাড়া, বাচচা ফোটানো -- পাখিদের এই কাজগুলো একই সূত্রে গাঁথা। বংশবৃদ্ধির স্বার্থেই নির্দিষ্ট সময়ে এরা বাসা তৈরির জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

পাখি বিজ্ঞানীদের মতে, (এদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ পাখি বাসা বাঁধে মে, জুন, জুলাই এই তিন মাসের মধ্যে। বাসা তৈরির জন্যে এ সময়টিকে বেছে নেবার পেছনে কতকগুলো কারণ রয়েছে। এই সময়ের বাতাসের আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা এবং দু-এক পশলা বৃষ্টি কীট-পতঙ্গের বংশ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক।) ফলে পাখিরা বুঝতে পারে যে তাদের নিজেদের এবং বাচচাদের খাদ্যের ব্যবস্থা এই সময়ে মোটামুটি ভাবে নিশ্চিত। তা ছাড়া দিনের দৈর্ঘ্য রাতের তুলনায় বেশি বলে খাদ্য সংগ্রহের সময়ও পর্যাপ্ত। সুতরাং এই দিনগুলোতেই তারা নীড় বাঁধে, ডিম পাড়ে এবং বংশবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়।

ডিম পাড়ার সময় এলে পাখিরা নীড় বাঁধার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রজনন ঋতু এলে অনেক পুরুষ পাখির দেহে বর্ণময় বিশেষ ধরনের পালক দেখা যায়। তখন তাদের অপরূপ দেখায়। কানি-বকের পিঠে গজায় তামাটে রংয়ের মসৃণ পালক। মাথার পেছনে দেখা দেয় লম্বা শাদা ঝুঁটি। এই সময় পুরুষ পাখিরা গান গায়। চিৎকার করে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে চায়। গাছের ডালে বসে, ঝোপেঝাড়ে থেকে অবিরাম ডাকতে থাকে। সঙ্গিনীকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। ময়ূর নাচে পেখম মেলে। (পুরুষ নীলকণ্ঠ স্ত্রী-পাখিকে মুগ্ধ করার জন্যে শূন্যে ডিগবাজী খায়।)

চিড়িয়াখানাতে পাখিরা কেমন করে দিন কাটায় তা দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করেছেন পিওতর মান্তেইফেল। তিনি রাশিয়ার একজন

বিশিষ্ট প্রকৃতি-বিজ্ঞানী। তার বিবরণে জানা যায় চিড়িয়াখানাতে থাকা পাখিদের বাসা বানাবার বৈশিষ্ট্য। তার লেখায় ফুটে উঠেছে পাখিদের নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার স্বভাব।

''চিড়িয়াখানায় যে-সব পাখি ডিম দেয় না, বন্য অবস্থায় তারা যে-সব প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে বাসা বাঁধতো, চিড়িয়াখানার রূপান্তরিত অংশগুলো হলো তার অনুরূপ। সবাই অধীর হয়ে রইলাম বসন্তের মরশুমের জন্যে। অবশেষে মধু ঋতু। বড় হয়ে উঠতে লাগল দিন, আকাশ গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো ভরত পাখির গানে। দক্ষিণ থেকে উড়ে আসতে শুরু করলো পাখির সঙ্গীব ঝাঁক। শহরের ওপর দিয়ে অনেক উঁচুতে ত্রিভুজের আকারে উড়ে যেতে থাকল হংস-বলাকার দল। আর রাত্রে শোনা গেল তুন্দ্রাগামী যাযাবর স্নাইপ পাখির অদ্ভুত কিন্তু সুরেলা শিস। চিড়িয়াখানাতেও চঞ্চল হয়ে উঠল শ্বেতগণ্ড হাঁসেরা। কয়েক বছর আগে এদের আনা হয়েছিলো (নরওয়ে উপকূল) থেকে। কিন্তু চিড়িয়াখানায় তারপর একবারও বাচ্চা দেয় নি। এখন তারা হয়ে উঠলো উত্তরমুখী। ছুটে জল থেকে উড়ে যাবার চেষ্টা করলো তারা। কিন্তু পাগলের ভঙ্গিতে খানিকটা অসহায়ের মতো ফের নেমে এলো পুকুরে। উড়তে পারে নি, কারণ ডানার ডগার পালক ছিলো কাটা।

দু সপ্তাহ পরে জলচর পাখিদের উত্তরে উড়ে যাবার মরশুম শেষ হলো, শান্ত হয়ে এলো শ্বেতগণ্ড হাঁসেরাও। তাদের মনে হতে লাগলো যেন কোনো নতুন জায়গায় উড়ে এসেছে। কেবল এর পরেই তারা জুড়ি বেঁধে বেঁধে পাথুরে টিপিটায় বাসা বাঁধার মতো সুবিধাই জায়গা খুঁজে বেড়ালো। যে-সব জায়গায় কোনো একটা মাদী বাসা বাঁধা নিয়ে ব্যস্ত সেখানে তার মর্দা অন্য কোনো মর্দাকে ঢুকতে দিতো না। অমন ভীরু চুপচাপ হাঁসগুলো হয়ে উঠলো দজ্জাল খেঁকুরে। শান্ত হলো কেবল সবাই বাসা পাবার পর।

শেষ পর্যন্ত ডিমে তা দিতে বসলো মাদীরা। আর মর্দাগুলো তাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে অন্য পাখির হামলা থেকে নির্ভয়ে রক্ষা করতে লাগলো তাদের।

আটাশ–উনত্রিশ দিন পর ডিম ফুটে ছানা বেরুলো। জলে দেখা গেলো জোড়ায় জোড়ায় শ্বেতগণ্ড হাঁস। তাঁদের সঙ্গে চার-পাঁচটি করে সবজেটে ছানা।

চিড়িয়াখানার ঝিলে বসানো চাপড়াগুলো থেকে যখন হোগলা গজালো এবং সেখানে খুঁড়ে রাখা গর্তগুলোনেত ভেতর দিকটা একেবারে ঢাকা পড়ে গেলো। তখন এমন আরো কতকগুলো জাতের হাঁসের নজর পড়লো সে-সব জায়গায়। যারা চিড়িয়াখানায় আগে কখনো বাসা বাঁধতো না। জলে বুক দেবে যেন সবার অলক্ষ্যে চুপিসারে তারা ঢুকে পড়তো হোগলার ভেতরে। পেট থেকে পালক ছিঁড়ে তা বিছাতো গর্তগুলোয়। তারপর ডিম দিতে লাগলো।

তা দেওয়া শুরু হবার চব্বিশ থেকে আটাশ দিনের মধ্যে চিড়িয়াখানার ঝিল ভরে গেলো নানা জাতের হাঁসের বাচ্চায়।

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছটাও অবহেলিত রইলো না। কাঠি বিচালি আর সেখানকার বাসিন্দা পাখিদের পালক দিয়ে নিপুণভাবে তাতে বাসা বানালো বুলফিঞ্চ পাখিগুলো।

প্রকৃতিতে কী কী পরিস্থিতিতে পাখিদের বংশবৃদ্ধি হয় তার অধ্যয়ন চালিয়ে আমরা চিড়িয়াখানায় কৃত্রিমভাবে তা গড়ে নিই। এইভাবে ফিঞ্চ, নাইটিঙ্গেল, তিতির, উড-গ্রাউজ প্রভৃতি বহু জাতের পাখিকে বাচ্চা দিতে বাধ্য করেছি আমরা। (শুধু ঈগল প্রভৃতি যে-সব শিকারী পাখি প্রকৃতিতে বাসা বাঁধে উঁচু উঁচু গাছে, চিড়িয়াখানায় তাদের জন্যে উপযুক্ত পরিস্থিতি গড়ে তোলা যায় নি।) (তাছাড়া ওড়ার সুযোগ সীমিত

থাকায় তাদের ব্যায়াম হতো না। তাতে দুর্বল হয়ে পড়ে পেশী ভেতরকার সমস্ত দেহযন্ত্রের কাজই বিঘ্নিত হয়।) অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে,(বেশি রকম ডানা-কাটা লাল হাঁস এবং অন্যান্য যে-সব পাখি ওড়ার সুযোগ পায় না, চিড়িয়াখানায় তাদের বাচ্চা হয় না।)

প্রকৃতিতে এক-একটা জাতের পাখির পক্ষে বাসা বাঁধার যা বৈশিষ্ট্য কোনো পাখিতে তা লঙ্ঘন করতে দেখা গেছে কদাচিৎ।

তাই মরুভূমিতে একবার মাটিতে ঈগল পাখির বাসা দেখে আমার অবাক লেগেছিলো। এরা সাধারণত বাসা বাঁধে উঁচু উঁচু গাছে। রাশি রাশি হাড় আর ডাল দিয়ে বাসাটা তৈরি। সেটা খানিকটা তুলতে দেখলাম তলে রয়েছে দেবে-যাওয়া একটা গাছগাউন গাছ। তখন বুঝলাম এ ঈগলও তার জাতের অভ্যাস বদলায় নি। দেখে মনে হচ্ছে প্রথমটায় সে বাসা বানিয়েছিলো গাছেই। সেখানে সে বাচ্চা ফুটিয়েছে বহু বছর ধরে। আর প্রতিবারই নতুন নতুন মাল-মসলা দিয়ে বাসা সম্পূর্ণ করেছে। শেষে বাসাটা এতো ভারি হয়ে ওঠে যে মরুভূমির এই টুনকো গাছটা ভেঙে পড়ে আর বাসাসমেত ঈগলও নেমে আসে মাটিতে।

বাসা বাঁধার প্রথা ও বাসস্থানের পরিস্থিতি ছাড়াও আরো কতকগুলো শর্তের ওপরেও বংশবৃদ্ধি নির্ভর করে। যেমন দাঁড়কাকেরা বাসা বাঁধে সাধারণত পরস্পর খুব কাছাকাছি বড় একটা বসতি গেড়ে।)

(চিড়িয়াখানায় তারা একবারও ডিম পাড়ে নি। কেননা মনে হয় বংশবৃদ্ধির তাগিদ বোধ করার জন্যে বাসা ছাড়াও তাদের আরো দরকার চেঁচামেচি, ডাকাডাকি, পাখার ঝাপটানি ও স্বজাতির নৈকট্য। গাংচিল মার্টিন গোলাপী স্টার্লিঙ্গ প্রভৃতি যে-সব পাখি একসঙ্গে বসতি পেতে বাসা বাঁধে তাদের বেলাতেও এটা প্রযোজ্য।

(একসঙ্গে বসতি পেতে যারা থাকে: দাঁড়কাক সিন্ধু-চিল, সোয়ালো প্রভৃতিরা খাবারের জন্যে বহুদূর উড়ে যায়। বাসার কাছাকাছি খাদ্য-সংস্থানের ওপর নির্ভর করে না। শিকারী পাখিদেরও শিকার এলাকা অনেক বড় কেননা ছোটো এলাকায় শিকার মেলা কঠিন।)

(মস্কোর চিড়িয়াখানায় সবুজ সবুজ ঝিলমিলে অস্ট্রেলীয় টিয়া পাখি আছে প্রচুর। থাকে তারা জালি তার ঘেরা বড় বড় খাঁচায়।) ছিমছাম চঞ্চল এই পাখিগুলো তাদের উচ্ছল কিচির-মিচিরে বাতাস ভরে তোলে।

স্বদেশে, (অস্ট্রেলিয়ার তারা বাচচা পাড়ে গাছের কোটরে।) আমাদের দেশের ফিঞ্চ বা থ্রাশ পাখির মতো কখনোই খোলা বাসা বানায় না। (সামনে ঢোকার ফুটো রেখে কাঠের ছোটো ছোটো ঢাকা বাক্স টাঙিয়ে দিলে কেবল তাতেই চিড়িয়াখানাতেও ওই অস্ট্রেলীয় বন্দীরা ছোটো ছোটো শাদা ডিম দিতে থাকে।)

(শুধু এই ঢাকা বাক্স আর কৃত্রিম কোটর ছাড়া অন্য কোনো বাসাতেই বাচচা দেয়নি টিয়ারা।)

একবার, ডিম পাড়ার ঠিক মরশুমের সময় আমরা কাঠের বাসা আর কৃত্রিম কোটরগুলো সরিয়ে নিই। ভেবেছিলাম ডিম পাড়ার আসন্ন বেগ তাতে আটকাবে না, খাঁচার মেঝেতেই ডিম দেবে। কিন্তু সেটা হলো না। (কাঠের বাসাগুলো সরিয়ে নিতেই জুড়ি বাঁধা টিয়াগুলোর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো। বন্ধ হলো ডিম পাড়া। কাঠের বাক্সগুলো ফের টাঙাতে দ্বিতীয় বার সজীবতা শুরু হলো। জুড়িতে জুড়িতে ফের ভাগ হয়ে গেল টিয়ারা। ডিম পাড়লো তা দিলো আর ষোলো দিন পর তা থেকে ফুটে বেরোলো ন্যাংটা ন্যাংটা বাচচা।) মা-বাপ দুজনেই তাদের খাওয়াতে লাগলো তাদের উদ্গার দিয়ে।"

পুরুষ কাক, কবুতর ও মাছরাঙা পাখিরা সঙ্গিনীকে ভালো খাবার উপহার দিয়ে আকৃষ্ট করতে চায়।)

বিভিন্ন পাখির বাসার আকার আর গঠনের মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের বৈচিত্র্য।

টুনটুনি কয়েকটি পাতা জোড়া দিয়ে বানায় তার ছোট্ট বাসা। নিপুণভাবে সেলাই করে পাতাগুলোতে দেয় জোড়া। আবার বড় পাখিরা বিশাল গাছের ডালে বাঁধে বিশাল আকারের বাসা। বাসা বাঁধবার রীতি দেখে পাখিদের বিচিত্র স্বভাব বোঝা যায়।

মাটিতে বাস করে যে-সব পাখি তারা সমান্য একটু মাটি খুঁড়ে, ছোট গর্ত বানিয়ে তার মধ্যে ডিম পেড়ে রাখে। অন্যদিকে বাবুই পাখির কাছে বাসা বানানো যেন অপরূপ এক শিল্পকর্ম। কুশলী কারিগরের মতো বাসা বোনে বাবুই পাখি। ডিমগুলিকে সযত্নে রাখার জন্যে বাসার ভেতরের দিকে আবার আলাদা একটি ঘর তৈরি করে। সেই ছোট্ট ঘরের বুনোনও খুব নিখুঁত।

দেয়াল বা গাছের গুঁড়ির ফাঁকে ঘাস ও শিকড় বিছিয়ে বাসা বাঁধে আমাদের জাতীয় পাখি দোয়েল। কখনো তারা পরিত্যাক্ত ল্যাম্প পোস্টের মাথাতেও বাসা বাঁধে। এ-সব বাসায় ওরা তিন থেকে পাঁচটি হাল্কা নীলাভ রংয়ের ডিম পেড়ে থাকে। পুরুষ দোয়েল শাদা-কালোয় মেশানো। স্ত্রী-পাখিদেব গায়ে কালোর বদলে দেখা যায় বাদামী আর শ্লেটের মতো ধূসর রং। পুরুষ পাখির ঠোঁট থেকে লেজের উপরিভাগ এবং বুক থেকে চিবুক পর্যন্ত নীলাভ কালো। কালো ডানার উপর রয়েছে দীর্ঘ শাদা ডোড়া। দোয়েলের চোখ সিঁদুরের মতো লাল। গাইয়ে পাখিদের মধ্যে দোয়েল হলো শ্রেষ্ঠ। মিষ্টি শিস দেয়ার সময় ক্রমাগত লেজ নাচাতে থাকে। শিমূল, মাদার ফুলের মধু খায়।

অনেক পাখি মরা গাছের ডালের কোটরে বা দেয়ালের কোনো ফুটোর মধ্যে নরম ঘাসপাতা বিছিয়ে বাসা তৈরি করে। কেউ আবার লম্বা সুড়ঙ্গের মতো বাসা বানায়। কেউ গাছের ডালে ঘাসপাতা, শুকনো কাঠি দিয়ে থালের মতো বাসা বাঁধে।

জলচর পাখি জাসানা ভাসমান চাতার ওপর বাসা বানায়। পানির ঢেউতে ভাসতে থাকে এ-সব বাসা।

ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত গায়ক পাখি থ্রাসোর বাটির আকারে বাসা বাঁধে। লম্বা লেজের টিটের পাখির বাসা দেখতে অনেকটা গম্বুজের মতো। সোঅলো ও গাঙ-শালিকেরা বাসা বাঁধার জন্যে ব্যবহার করে মাটি। সুইফটরা ব্যবহার করে নিজেদের লালা। অস্ট্রেলিয়ার বাওলার পাখি বাসা বানিয়ে তার উপর আবার রং করে। এর ফলে দূর থেকে এদের দেখায় খুব উজ্জ্বল। সবুজ পাতার ফাঁকে এদের রঙিন বাসা দেখার মতো। বিশাল ঠোঁটের হনবল বা ধনেশের সঙ্গিনী যখন ডিমে তা দেয় তখন সে তাকে সম্পূর্ণভাবে বাসার মধ্যে ঘিরে রাখে। কেবল একটি ছোট গবাক্ষ দিয়ে মাঝে মাঝে এসে তার গৃহিণীকে আহার করিয়ে যায়।

নাটহ্যাচোর পাখি গাছের কোটরে কিংবা দেয়ালের গর্তে বাসা বাঁধে। এরা (বাসার জন্যে ৬000 উপাদান সংগ্রহ করে। টিট পাখি তার গম্বুজের আকারে বাসা নির্মাণ করতে ২000 পালক সংগ্রহ করে।)

(অস্ট্রেলিয়ার টার্কি পাখি ঝোপে পা দিয়ে দিয়ে খড়-কুটোর এক বিশাল গাদা তৈরি করে তার ওপর ডিম পেড়ে যায়। পরে এই খড়-কুটোর গাদা পচে যে উত্তাপ সৃষ্টি হয় সেই উত্তাপে তাদের ডিম ফোটে।)

জীববিজ্ঞানীরা পাখিদের নীড় বাঁধার ব্যাপারে দীর্ঘ দিন গবেষণা করে অনেক তথ্য পেয়েছেন। তাদের মতে, নিতান্ত সীমিত বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা পাখিরা ঠিক নীড় নির্মাণের স্থান নির্বাচন করে তা বলা শক্ত। কারো কারো মতে, এই নির্বাচন হচ্ছে কতকগুলি স্বয়ংসিদ্ধ প্রতিক্রিয়ার ফল। যাকে বলা হয়, 'হ্যাবিচুয়াল সিলেকশন' বা স্বাভাবিক নির্বাচন। (অর্থাৎ পাখিরা যে স্থানে জন্মেছিলো এবং প্রতিপালিত হয়েছিলো, নীড় নির্মাণের সময় তারা সেইখানেই ফিরে আসে।) সুতরাং এইভাবে তারা এমন একটি স্থানে নীড় নির্মাণ করে যা তাদের পূর্ববর্তীদের দ্বারা নীড় নির্মাণের পক্ষে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছিলো।

কোনো কোনো প্রজাতি নীড় বাঁধবার আগে ভালো করে দেখে নেয় আশেপাশে কোথাও তাদের কোনো জাত-ভাই বাসা বেঁধেছে কিনা। কিছু পাখি আছে যারা কাছাকাছি বাসা তৈরি করে একাসাথে থাকতে ভালো-বাসে। কিছু আছে যারা এক জায়গায় দু জোড়া পাখি কখনো বাসা বাঁধবে না।)

টুনটুনি) আর (রবীন) পাখিরা একলা থাকতে পছন্দ করে। গাছপালার আড়ালে রাখে নিজেদের আত্মগোপন করে। বক আর সারস-জাতীয় পাখিরা থাকে দলবদ্ধভাবে।

বিজ্ঞানীরা এ ধরনের স্বভাবের একটি কারণ বের করেছেন। তাদের মতে, (ছোট পাখিরা বেশি দূর পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে না। তাই ওদের খাবার সংগ্রহ করতে হয় বাসার আশপাশ থেকে। সেজন্যে ওরা চায় না যে তাদের নীড়ের কাছাকাছি খাবারের অন্য অংশীদার জুটুক।) (অন্য দিকে বড় পাখিরা খাবারের খোঁজে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। কাজেই তাদের পক্ষে আশেপাশে খাবারের অন্য অংশীদার থাকলেও তেমন অসুবিধে হয় না।)

(আত্মরক্ষার জন্যে পাখিরা নীড় বাঁধে।) তারা চায় শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখতে। অনেক পাখি মৌমাছি আর বোলতার চাকের কাছে বাঁধে বাসা। অনেক কাঁটা ঝোপের মধ্যে বানায় বাসা। এর ফলে হয়তো শত্রুরা সেই কাঁটার দুর্গের ভেতর প্রবেশ করতে পারে না। সাধারণত বাসাগুলির মুখ হয় পুব দিকে। এর ফলে সারাদিনের চড়া রোদের হাত থেকে ছানারা রক্ষা পায়।

বাসা বাঁধা ও সন্তান পালনে পাখি সম্পতি নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব সমানভাবে ভাগ করে নেয়।

চড়াই অনেকটা আমাদের ঘরের পাখি। চিরিপ চিরিপ করে ডেকে ছুটোছুটি করে। ঘুলঘুলিতে কড়ি কাঠের ফাঁকে বাসা বানায়।

বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে চড়াই
কুঁড়েঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই।

কবিতায় বাবুই চড়াইকে পরের ঘরের বাসিন্দা বলে উল্লেখ করেছে। আসলে চড়াই কিন্তু নিজের হাতেই তার ছোট্ট নীড়টি গড়ে।

ঘরের ভেতরে কোথাও কোনো ফাঁক পেলেই সেখানে বাঁধবে বাসা। সেটা দেয়ালের গায়ে, বানিশে, খড়ের চালে, টালি বা খাপড়ার ফাঁকে হতে পারে।

ডিম পাড়ার সময় হলে চড়াই গা ফোলাবে। ডানা দুটো দু পাশে নামিয়ে লেজ অল্প তুলে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ডাক দেবে। বছরের যে কোনো সময় পাড়ে ডিম।)

(এদের বাসার কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই।) ডিমের মতো গোলাকার অনেকটা। বাসার একদিকে থাকে একটি প্রবেশ পথ। ঘাস, খড়, ছেঁড়া কাপড়, পশম এ-সব দিয়ে ওদের বাসার উপকরণ হয়। যেখানটায় ডিম পাড়ে, সেখান পালক বিছিয়ে নরম করে রাখে।

জংলি চড়াই বাসা বাঁধে গাছের গর্তে বা ফোকরে। (কাঠঠোকরা বা বসন্ত বাউরি ফেলে যাওয়া বাসা পছন্দ করে।)

বাবুই পাখির বাসার প্রশংসা সবাই এক বাক্যে করবেন। পাখিটি অত্যন্ত নিপুণভাবে বাসা বুনতে পারে। সাধারণ শুকনো ঘাসজাতীয় জিনিসকে এরা এমনভাবে ব্যবহার করে যাতে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

একজন বিশেষজ্ঞ একবার পথ চলতে গিয়ে বাবুই পাখির কয়েকটি নতুন ধরনের বাসা দেখতে পেয়েছিলেন। "ক্রসিং-এর পাশেই একটা তালগাছ। তার উপর থেকে ঝুলছে অদ্ভুত ধরনের কয়েকটি পাখির বাসা। পাখির বাসা বললে আমাদের মনে যে ছবি ভেসে ওঠে তা একদমই নয়। সাপুড়েদের বাঁশি, তুবড়ি বা বকযন্ত্রের লম্বা নলটা নিচের দিকে মুখ করে যেন টাঙানো আছে। অবাক হয়ে দেখছি বাসাটা শুকনো ঘাসজাতীয় জিনিসের টানাপোড়েনে দিয়ে কী অদ্ভুত সুন্দরভাবে বোনা। গোটা দশেক তালগাছের ডালগুলো থেকে ঝুলছে।

হঠাৎ দেখি হলুদ আর পাটকিলে রংয়ের একটা চড়াইয়ের মতো পাখি কোথা থেকে উড়ে এসে লম্বা ঝুলন্ত মোটা নলটার মুখের ভিতর দিয়ে সটান ঢুকে গেলো। লক্ষ করলাম বাসার প্রবেশ পথ বা নল দিয়ে বসে পড়ে স্বাভাবিক মতো ঢুকলো না। আর একটা পাখিকেও দেখলাম ওই ভাবে সটান ঢুকে পড়তে। বুঝলাম এটা ওদের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

পাখিটি হল বাবুই। হিন্দিতে বলে, বায়া, চিন্দোরা বা বার। বাংলাদেশে কোথাও কোথাও একে 'তাল বাবুই' বলে।"

ঘন জঙ্গল পছন্দ করে না বাবুই। স্যাঁতসেঁতে জলা জমির ধারে বাবলা বা তালগাছে বাসা বাঁধে। কখনো মহুয়া, খেজুর ও বাঁশগাছেও বাসা বাঁধে। (দক্ষিণ ভারতে নারকেল গাছে এদের বাসা বুনতে দেখা

যায়। বার্মাতে বাবুইরা বারান্দা বা খোলার চালের কোণে বাসা বাঁধে।) বাবুইদের বাসা বানাবার পদ্ধতি থেকে জীবন যাত্রা নিয়ে প্রথম গবেষণা করেন টি.এ. ডেভিস। তিনি গাছের উপর মাচা তৈরি করে দিনের পর দিন ধৈর্যসহকারে বসে থেকে বাসা বানানোর ধারাবাহিক পর্যায় থেকে ডিম ফুটিয়ে বাচচা বড় করে তোলা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেছেন। (অনেক সময় দেখা যায় এক এক দলে ২০ থেকে ১০০টি বাবুই পাখি ঘোরাফেরা করে। নভেম্বর থেকে এপ্রিল হলো এদের ডিম পাড়ার সময়।)

পুরুষ পাখিরা খুঁতখুঁতে। দক্ষ তাঁতি। অক্লান্ত কর্মী। (আবহাওয়া সম্পর্কে এদের যথেষ্ট ভালো জ্ঞান রয়েছে। কোন্ গাছে কোন্ স্থানে কতো কম পরিশ্রমে বাসা বানিয়ে ঝড়-বাদলের হাত থেকে বাঁচা যাবে এ-বিষয়ে তাদের কখনো ভুল হয় না।)

বিপজ্জনক পাখি

পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক পাখির নাম হলো—ক্যাসওয়্যারই। এমু-জাতীয় এই পাখি উড়তে পারে না। এদের পায়ের সাথে ধারালো ছুরির মতো নখর আছে। এটা দিয়ে অস্ত্রের মতো মানুষের পেট চিরে ফেলে। খুব সহজেই এরা অন্যান্য প্রাণীদের কাবু করে ফেলতে পারে।

ক্যাসওয়ারই পাখির মাথাটি যেন হাড়ের শিরস্ত্রাণ দিয়ে ঢাকা থাকে। এই শিরস্ত্রাণই তাকে নানা বিপদ থেকে বাঁচায়। এদের উচচতা ছয় ফুট। (ওজন ১৮০ পাউণ্ডের মতো।) সারা শরীরে চুলের মতো সরু সরু রুক্ষ পালক। কালো রঙের এই পাখিটির নীল বর্ণের মাথা দেখতে বেশ সুন্দর। এরা উড়তে পারে না ঠিকই কিন্তু সুঠাম পা ফেলে দ্রুতবেগে দৌড়োতে পারে। (ঘণ্টায় গতিবেগ ৩০ মাইল।)

রেগে গেলে এরা শূন্যে লাফ দিয়ে উঠে প্রতিপক্ষকে লাথি মেরে আঘাত করে। পায়ের তীক্ষ্ণ ধারালো নখর দিয়ে শত্রুকে চিরে ফেলে। ফালা ফালা রক্তাক্ত হয়ে যায় প্রতিপক্ষ।

স্ত্রী-পাখি ৩ থেকে ৬টি ডিম দেয়। ডিমের রং সবুজ। আকারে ১৩ সেন্টিমিটার। বাচচা ফোটানো এবং বাচচার দেখা-শোনা করে পুরুষ ক্যাসওয়্যারই।) (ফলমূল-পোকামাকড় এদের প্রধান খাদ্য।)

পাখি বিজ্ঞানীদের ধারণা এই পাখি আদিম অবস্থায় উড়তে পারতো। বিবর্তনের ধারায় ধীরে ধীরে ওড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এরা ক্যাসুয়্যারিডাই বর্গের প্রজাতি।

ক্যাসওয়্যারই পাখি নিউগিনী ও অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলে পাওয়া যায়।

আসা-যাওয়া

কিছু কিছু পাখি আছে যারা একই এলাকায় বাস করে। সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। সেখানেই বাসা বানায়। ডিম পাড়ে। সেখানেই ছানাদের বড় করে তোলে। কিন্তু অনেক পাখি আছে যারা একই এলাকায় বেশি দিন থাকে না। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন জায়গায় থাকে। একটি জায়গায় এক ঋতুতে এসে অন্য ঋতুতে ফিরে যায়।

শরতের শুরু থেকে বসন্তের শেষ অবধি খেয়াল করলে দেখা যায় এমন কিছু পাখি যাদের কয়েক মাস আগেও দেখা যায় নি। পাখিগুলো অবশ্য অচেনা নয়। প্রতিবছর ঐ সময়ই ওরা আসে। মওসুমী পাখি ওরা।

শীতকালে হিমালয়ের উত্তরের দেশগুলোর অবস্থা ঠাণ্ডায় কাহিল। শীতে ওদের কাবু করে ফেলে। খাবার পায় না। থাকার জায়গা পায় না। তখন তারা ঐ সমস্ত অঞ্চল থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। আমাদের

দেশে ততো ঠাণ্ডা পড়ে না। খাবার পাওয়া যায় প্রচুর। ফলে ঐ সমস্ত পাখি 'শীতের অতিথি' হয়ে আমাদের দেশে আসে। ঝাঁকে ঝাঁকে। দলে দলে।

আমাদের দেশে পাখিদের আসা-যাওয়া ঘড়িব দোলকের মতো। শরতের শুরুতে আসে. গরম শুরু হবার আগে আগে চলে যায়। প্রতি দিন বাসা ছেড়ে খাবার খুঁজতে যাওয়া-আসার চেয়ে কঠিন দেশান্তরী হয়ে আবার ফিরে আসা। পাখির রক্তের তাপ ও পালকের আবরণ প্রচণ্ড শীত সহ্য করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তবুও তারা দেশান্তরে পাড়ি দেয়। পথে থাকে নানান ঝামেলা। তবুও বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে এরা এ-ভাবেই আসা-যাওয়া করছে দেশ থেকে দেশান্তরে। আশ্চর্যের কথা, হিসেবে ও চিহ্ন রেখে দেখা গেছে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে একই পাখি ফিরে আসতে পথ ভুল করে নি। আকাশ-পথে এরা কি দেখে, কোন্ পথে পরিচিত স্থানে হাজির হয়, তা বিজ্ঞানীরা অল্প-বিস্তর জানতে পেরেছেন। পাখিরা কি পৃথিবীর গতি থেকে পথের নিশানা পায়, নাকি পৃথিবীর চৌম্বক নিয়মের ভেতর থেকে চলার ইশারা পায়? ব্যাপারটি রহস্যময়।

যে-কথা সহজে ধরে নেয়া যায় তাহলো পাখির চোখ দিয়ে দেখেই পথ চিনে নেয। দিনে সূর্য আর রাতে তারার নিশানায় পাখিরা ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় আকাশে ওড়ে। রাতের বেলায় যে পাখি উড়ে আসে তারা সাধারণত এক হাজার মিটার উঁচু দিয়ে ওড়ে। কুয়াশা ঢাকা রাতে বা মেঘলা রাতে এ উচ্চতার তারতম্য হতে পারে।

সুদূর থেকে উড়ে আসা হাঁসগুলো ঘণ্টায় গড়ে পঁচিশ-তিরিশ কিলো-মিটার বেগে ওড়ে। সাইবেরিয়া থেকে আসে এক জাতের সোনালি বাটান পাখি। তারা না থেমে এক নাগাড়ে তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটাব পথ উড়ে আসে। পথে হিমালয়ের বাধা খুব সহজেই তারা পার হয়ে আসে।

অনেক জাতের পাখি, যেমন হাঁসেরা আসে ঝাঁক বেঁধে। কোনো কোনো পাখি একাই উড়ে যায়। পথ চলতে চলতে তারা নিজ গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য পাখির সাথে যোগাযোগ রাখে ডেকে ডেকে।

পাখিদের আসা-যাওয়ার পথটি জানতে হলে তাদের অনুসরণ করা দরকার। বিজ্ঞানীরা পাখির পায়ে আংটি পরিয়ে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করেছেন। কোনো বিশেষ পাখি বা পাখির ঝাঁককে এলুমিনিয়ামের অথবা হালকা ধাতুর পাতের আংটি পরিয়ে দেয়া হয়। ঠিকানা আর সংখ্যা খোদাই করা থাকে সেই আংটিতে। তার পর সেই পাখিদের ছেড়ে দেয়া হয়।

যাযাবর পাখি

আবহাওয়ার যখন তারতম্য ঘটে, পরিবর্তন হয় ঋতুর। সে-সময়ই নীড় থেকে বেরিয়ে পড়ে যাযাবর পাখির দল। উড়ে চলে দূর দূরান্তে। এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে।

এইসব পাখিরা যখন বুঝতে পারে ঠাণ্ডা নামছে। আর টেকা যাবে না এখানে। পাওয়া যাবে না খাবার। তখন উষ্ণতার খোঁজে চলে আসে দক্ষিণে। প্রতি বছর নির্দিষ্ট এলাকায় এসে পৌঁছুচ্ছে। আব মওসুম শেষ করে ফিরে যাচ্ছে ফেলে আসা নীড়ে। কিন্তু এই নির্ভুল আসা-যাওয়া তারা করে কি ভাবে?

উত্তর জানতে বহু পরীক্ষা চালিয়েছেন পাখি বিজ্ঞানীরা। একদল সারসকে তাদের দেশান্তরি হবার আগে ধরে নিয়ে গিয়ে বহু দূরের এলাকায় ছেড়ে আসা হলো। কিন্তু দেখা গেলো মওসুম পাল্টাতেই তারা তাদের পছন্দমত নির্ভুল স্থানেই উড়ে গেলো। ঠিক একইভাবে মওসুমের শেষে ঠাণ্ডা কমতেই ফিরে গেলো নিজেদের পুরনো বাসায়।

একবার কিছু পাখি ধরে ৬৫০ কিলোমিটার দূরের এক জায়গায় ছেড়ে আসা হয়। কিন্তু পথ না হারিয়ে ঠিক সবাই নিজের নীড়ে ফিরে এলো। হয়তো পৃথিবীর সাথে, তার চৌম্বকশক্তির সাথে কোনো গোপন যোগাযোগ আছে পাখিদের।

পাখি বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত মতামত দিয়েছেন—এইসব হলো যাযাবর পাখিদের সহজাত প্রবৃত্তি। এবং তা খুবই প্রখর। ফলে কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়াই এরা প্রয়োজন মতো উড়ে যায়। আবার উড়ে আসে।

তবু এইসব যাযাবর পাখি এক মহাবিস্ময়। মহারহস্য।

দেশান্তর

পাখিদের দেশান্তরী হওয়া মানুষের কাছে আজো এক মহাবিস্ময়। মহারহস্য। প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে কেন এরা আকাশে ডানা মেলে চলে যায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে। মহাসাগর, মহাদেশ পার হয়ে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে পৌঁছয় একটা নির্দিষ্ট স্থানে। কেন এ-ভাবে পাখিরা দেশান্তরী হয় সমস্ত বিপদ-আপদ উপেক্ষা করে? পথের নিশানাই-বা পায় কেমন করে?

পাখির জগতের এই দেশান্তরী প্রবৃত্তির গতি-প্রকৃতি, প্রভাব ও মানুষকে আজ পর্যন্ত কৌতূহলী, অবাক ও জিজ্ঞাসু করেছে।

মহাকবি হোমার সারস ও নাকুটি পাখির যাযাবরত্বের কথা লিখে গেছেন তাঁর ওডেসি কাব্যে। আবার গ্রীক কবি আনাক্রেয়ন ও দার্শনিক এরিস্টটলও পেলিক্যান, কোকিল, বাজ প্রভৃতি প্রজাতির পাখি যে ঋতু-বিশেষে দেশান্তরী হয় সে খবর রাখতেন।

রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি দ্বিতীয় ফ্রেডরিক ১২৪৫ সালে শিকার-সম্পর্কিত একটি বই লিখেছিলেন। সেই বইটির ১১টি অধ্যায় জুড়ে রয়েছে দেশান্তরী পাখিদের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা।

এ-ভাবে মানুষের কৌতূহল বেড়েছে এই দেশান্তরী বা যাযাবর পাখিদের নিয়ে। মানুষের গবেষণা এ ব্যাপারে অনেক কিছুই জেনেছে। আবার

অনেক কিছু এখন পর্যন্ত অজানাই থেকে গেছে। এ বিষয়ে নানা জনে করেছেন নানা রকম অনুমান ও পরীক্ষা।

আদ্যিকালের মানুষেরা ভাবতো আর অবাক হতো। এক দিনে কি ভাবে উধাও হয়ে যায় এত পাখি? কোথায় যায়। কেন যায়। কেউ ধারণা করতো শীত নামার সাথে সাথে পাখিরা গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ে এবং শীত কালটা ঘুমিয়েই কাটায়। কিংবা গভীর পানিতে ডুব দিয়ে পাখিরা পুরো শীত ঋতু পার করে। কেউ কেউ মনে করতেন পাখিরা শীত কালটা চাঁদে গিয়েই কাটায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত প্রখ্যাত পণ্ডিত লিন্নায়ুয়াস পর্যন্ত এ ধরনের ধারণার বিশ্বাসী ছিলেন।

শীতপ্রধান দেশের পাখিদের এই বিচিত্র দেশান্তরের ব্যাপারটি আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র কয়েক দশক আগে। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ-সব উদ্ভট কল্পকাহিনীর অবসান হয়েছে। পাখিরা কেন স্বদেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে শীতকাল কাটায়, অথবা এদের ভ্রমণবৃত্তান্তের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় এখন জানা গেছে। যদিও এখনো অজ্ঞাত রয়েছে অনেক রহস্য।

অনেক পথ অতিক্রম করে এই পাখিরা শীতের আগেই আসতে শুরু করে। উষ্ণ আবহাওয়ার দেশে এসে এরা বাস করে নির্জন জলাশয় অথবা বনাঞ্চলে। খাদ্য আর শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার তাগিদেই দেশান্তরী হয় এ-সব পাখিরা। শীতপ্রধান দেশে এ-সময় পাখিদের আবাসগুলো বরফে আচ্ছাদিত হয়। পুরু বরফের নিচে চাপা পড়ে খাল-বিল, নদী-নালা, মাঠ-ঘাট সবই। পাতা ঝরে যায় গাছের। ভীষণভাবে খাদ্যে অভাব চলে পাখিদের।

শীতপ্রধান দেশে একটি প্রবাদ আছে। যদি চমৎকারভাবে জীবনকে উপভোগ করতে হয় তাহলে বসন্তকালে শহরে, গ্রীষ্মকালে সমুদ্র

উপকূলে বা পার্বত্য অঞ্চলে, আর শীতকালটা অবশ্যই উষ্ণ বা গরম কোনো দেশে কাটানো উচিত। দেশান্তরী পাখিদের বেলায় কথাটি একেবারে মিলে গেছে।

পৃথিবীতে প্রায় নয় হাজার জাতের পাখি আছে। সব জাতের পাখি মিলিয়ে মোট পাখি সংখ্যা প্রায় দশ হাজার কোটি। এর ভেতর আবার বেশি সংখ্যক হলো যাযাবর বা দেশান্তরী পাখি। পাখিরা কেন এক দেশ থেকে আরেক দেশে আনাগোনা করে এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন। কারো মতে ঠাণ্ডা বাতাস শুরু হলে এরা আর ওখানে টিকতে পারে না। কেউ-বা বলেন সে-সময়ে খাদ্যাভাব দেখা দেয় ওখানে। আবার বলা হয়ে থাকে এরা কোনো উষ্ণ অঞ্চলে যায় তখন ডিম পাড়তে। তবুও অনেক জাতের পাখিদের খাবার অভাব না থাকা সত্ত্বেও দূর দূরান্তে চলে যেতে দেখা যায়। এমন অনেক পাখি আছে যারা গ্রীষ্ম বা অন্য ঋতুতেও চলে যায় অন্য কোনো দেশে অনাদি কাল থেকে। প্রতি বছর পাখিরা দেশান্তরী হয়। আবার নিজের আবাসে ফিরে আসে। পাখিদের পরিব্রাজন এক বিস্ময় সবার কাছে।

পাখিদের এই দেশান্তর নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। বিশ্ববিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ও পক্ষীতত্ত্ববিদ পরলোকগত স্যার জুলিয়াস হ্যাক্সলি বলেছেন, যাযাবর পাখিদের এই দূর পাল্লার পাড়ি প্রকৃতি জগতের অন্যতম রহস্য। স্যার জুলিয়াস হ্যাক্সলি নিজেই এগুলো নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। অনেক তথ্য তিনি বের করতে সক্ষম হয়েছেন। দেশান্তরী পাখিদের এই সুদূর যাত্রা কোনো আনন্দদায়ক রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা নয়। প্রতি মুহূর্তে থাকে বিপদের সম্ভাবনা। পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, মরুভূমির ওপর দিয়ে হাজার হাজার মাইল উড়ে চলতে হয় এদের। অনেক পাখিকেই দিনের পর দিন সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেতে হয় উড়ে। হাজার হাজার মাইলের মধ্যে বসার জায়গা থাকে না। ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাতকে

উপেক্ষা করে উড়ে যায় লক্ষ্যস্থলের দিকে। বহু বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। ঝড়ে ধাক্কা খেয়ে অনেক সময় তারা নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে সরে চলে যায় অনেক দূরে। পথ খুঁজে পেতে তখন ক্লান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অনেক পাখি। সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে গন্তব্যে পোঁছে যে এরা কতো অসহায় ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে তা না দেখলে বোঝা শক্ত। আর গন্তব্য পোঁছেও তারা নিরাপদ নয়। গর্জে ওঠে শিকারির বন্দুক। এ-ভাবে অনেকেই আসে ঠিকই কিন্তু আর ফিরে যেতে পারে না।

পাখিরা হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এ-ভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায়। তাদের এই পরিব্রাজন প্রবৃত্তি সেই আদ্যিকাল থেকেই। পাখিদের ঘর ছাড়ার মূলে রয়েছে প্রধানত বংশগত সংস্কার আর সূক্ষ্ম পরিবেশগত উদ্দীপনা। এ-ছাড়া ডিম পাড়ার সময় অত্যধিক ভিড় এড়ানোর প্রবণতা, খাদ্যানুসন্ধান, সাথী খোঁজা প্রভৃতি নানা পরোক্ষ কারণও আছে। পাখি বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এক মহাদেশের পাখি বছরের পর বছর বিশেষ ঋতুতে প্রজনন ক্ষেত্র ছেড়ে ভিন্ন অঞ্চলে উড়ে যায়। এ-ছাড়া যে নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে যাযাবর পাখিদের আসা-যাওয়া এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গাটি তারা ডিম পাড়া ও বাচচা প্রতিপালনের জন্যে পছন্দ করে। তবে বরফ ঢাকা অঞ্চলে তারা সব সময়ই থাকে না। শীত পড়ার আগেই তারা সরে আসে উষ্ণ অঞ্চলে বা আগের সাময়িক আবাসে। আমাদের দেশে অধিকাংশ পাখিই এই নিয়মে হিমালয় অঞ্চল থেকে আসে শীতের শুরুতে। আর বসন্তের গোড়ায় আবার ফিরে যায়। তাই বলে যাযাবর বা দেশান্তরী পাখি মানেই যে শীতের পরিব্রাজনকারী এ ধারণা অমূলক। কারণ তিন শ্রেণীর পরিব্রাজনশীল পাখি রয়েছে। এরা শুধু শীতেই নয় বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন সময়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে আসা-যাওয়া করে। কেউ-বা শীতের সময় আসে। কেউ আসে বর্ষায়। আবার বসন্তে আসে

কেউ কেউ। (আমাদের দেশে এদের ভ্রমণ পরিকল্পনা অনুযায়ী নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণীতে দেশান্তরী পাখিদের ভাগ করা যায়:

ক. প্যালিয়ার্কটিক বা খাঁটি যাযাবর

খ. পারসিয়াল প্যালিয়ার্কটিক বা আংশিক যাযাবর।

গ. পারসিয়াল মাইগ্র্যাণ্ট বা ভ্রমণ-বিলাসী।)

এই তিন শ্রেণীর পরিব্রাজনশীল পাখিদের ভেতর ভ্রমণ পথের বা লক্ষের অনেক পার্থক্য আছে। তবে একটি ব্যাপারে এদের প্রায় সকলের মধ্যেই মিল। এরা যেখানে শীত কাটায় সেখানে স্থায়িভাবে বাসা বাঁধে না। শীত ফুরুলেই অন্যত্র চলে যায়।

শীতের শুরুতে পাখিরা উষ্ণতার জন্যে যায় উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণ গোলার্ধে। উত্তরের মনোরম আবহাওয়ায় ফিরে আসে বসন্তে। এটা যাযাবর পাখিদের প্রবৃত্তিতে দাঁড়িয়ে গেছে। পাখিদের দেশান্তর যাত্রা খুবই নিখুঁত। অনেক সময় ঠিক আগের বাসাতেও ফিরে আসতে দেখা গেছে। আবার যে জায়গায় আগের বছর গিয়েছিলো পরবর্তী বছর ঠিক সেই স্থানেও চলে যেতে দেখা গেছে। একরত্তি পাখি হামিং বার্ড। মানুষের বুড়ো আঙুলের চেয়েও ছোট। সেই ছোট্ট পাখিটিও প্রতি বছর শরৎকালে আমেরিকার উত্তর অঞ্চল থেকে উড়ে চলে যায় তিন হাজার মাইল দূরে পানামা খালের পাশে। আবার ফিরেও আসে।

দেশান্তরী পাখিদের সবচেয়ে আশ্চর্য ও চমকপ্রদ গুণ হলো, নির্ভুল-ভাবে দিক নির্ণয় ক্ষমতা। ভাবলে অবাক হতে হয়। কি ভাবে শীত-প্রধান ইউরোপের ছোট্ট পাখি সোআলো পাড়ি জমায় আমাজান অববাহি-কায় বা আর্জেণ্টাইনে। আবার ফিরে আসে ঠিক জায়গামতো। পাঁচ-ছয় হাজার মাইলের সুদীর্ঘ এই উড়াল পথে তার এতটুকুও ভুল হয় না। মনে হয় যেন পাখিটির পাখায় নির্ভুল কম্পাস বসানো আছে।

আসলে বিজ্ঞানীরা এখনো নির্ণয় করতে পারেন নি পাখিদের দেশান্তরের সঠিক কারণগুলো। হতে পারে এটা পাখিদের বংশানুক্রমিক প্রবণতা। সহজাত প্রবৃত্তি। কিংবা দেহজ গ্ল্যাণ্ডের ক্ষরণ অথবা আলোকরশ্মির আকর্ষণ। খাদ্য অন্বেষণের ব্যাপারটি যদিও সবচেয়ে বড়। তবে পরিবেশ এবং আবহাওয়া-সংক্রান্ত বিষয়টি তাদের পরিব্রাজনের বিশেষ কারণ হিসেবে ধরা হয়।

দেশান্তরী এই পাখিরা কেউ কেউ ওড়ে রাতের বেলায়। আবার কোনো কোনো পাখি দিনে। এদের উড়ে যাবার পথটি সাধারণত উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণ গোলার্ধে। কোনো পাখি পরিব্রাজন কালে অতিক্রম করে কয়েক শো মাইল পথ।

আবার কেউ কেউ হাজার হাজার মাইল। একটি গোল্ডেন প্লোভার পাখিকে শ্রেষ্ঠ উড়ালবাজ হিসেবে ধরা হয়। এতোটুকু বিশ্রাম না নিয়ে এই প্লোভারটি আলাস্কা থেকে হাওয়াই পর্যন্ত একটানা ২ হাজার ৪ শো মাইল পথ অতিক্রম করেছিলো।

ডারউইন দেশান্তরী পাখিদের নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তিনি খেয়াল করেছেন বছরের ঠিক বিশেষ একটি সময়ে পাখিরা দেশান্তরে যাত্রার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এইসব পরীক্ষা চালানোর জন্য তিনি দেশান্তরী একটি পাখিকে খাঁচায় পুরে রাখেন। দেশান্তরে যাবার সময় হলেই তিনি লক্ষ্য করেন যে পাখিটি মরিয়া হয়ে উঠেছে বাইরে আসবার জন্যে এবং খাঁচায় পাখা ঝাপটে নিজেকে রক্তাক্ত করে ফেলেছে।

আরেকটি পরীক্ষায় একটি যাযাবর রাজহাঁস তিনি ব্যবহার করলেন। দেশান্তরের সময় হাঁসটির পাখা কেটে দেয়া হলো। যেন উড়তে না পারে। কিন্তু দেখা গেল ঠিক সময়মতো রাজহাঁসটি পায়ে হেঁটেই যাত্রা শুরু করেছে।

ডারউইনের আরেকটি পরীক্ষা থেকে জানা যায়— অনেক সময় মা-পাখি তার ছোট ছোট বাচ্চাদের ফেলেই দেশান্তরে যায়। কিন্তু প্রতিটি প্রাণীরই তো নিজের বাচ্চার প্রতি ভীষণ টান থাকে। অথচ ছোট বাচ্চাদের ফেলেই কি ভাবে তারা দেশান্তরী হয়? (ডারউইনের মতে, প্রাকৃতিক নির্বাচন সূত্র অনুযায়ী পাখিরা দেশান্তর যাত্রা প্রবৃত্তিকে গ্রহণ করেছে তাদের বাঁচার তাগিদে। যারা এই দেশান্তর প্রবৃত্তিকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে তারাই গেছে বেঁচে। আর যারা আয়ত্তে আনতে পারে নি, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

যাযাবর পাখিরা বিভিন্ন পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে থাকে। সবচেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে আর্কটিক টার্ন নামক গাঙচিল জাতের একটি পাখি। ডিম পাড়ে উত্তর মেরু অঞ্চলে। ওখানে শীত আসার সাথে সাথে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর পেরিয়ে দক্ষিণ মেরুতে চলে যায় এরা। আবার গ্রীষ্মকালে চলে আসে। এই আসা-যাওয়ায় আর্কটিক টার্ন পাখি অতিক্রম করে প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল পথ। উডকক পাখিটি আকারে কবুতরের মতো। হিমালয়ের আট হাজার ফুট উপরে বাস করে। তবে শীতের সময় এরা দক্ষিণ ভারতে চলে যায় কিছু এবং কিছু কিছু আসে বাংলাদেশে। মধ্য ভারতে এটিকে দেখা যায় না। পরিব্রাজনকালে ১৫০০ মাইল পথ অতিক্রম করে উডকক। স্নাইপ জাতের পাখি জাপান থেকে বিনা বিশ্রামে সোজা ৩০০০ মাইল অতিক্রম করে শীতের দিনে চলে চলে যায় তাসমানিয়া। মাত্র ছ দিনে চার হাজার মাইল দূরে পৌঁছে অ্যালবাট্রস। এই হাজার হাজার মাইল চলার পথের নিশানা পাখিরা ঠিক করে কি ভাবে? অনেকের মতে সূর্য দেখে দিক ঠিক করে নেয় পাখিরা। এরা দিনের বিভিন্ন সময়ে কি ভাবে কোথায় সূর্য অবস্থান করে তার হিসেব রাখে। (বংশগতভাবে তাদের মনে মনে গাঁথা হয়ে থাকে দিকের নিশানা) তাই তো ঠিক ঠিক পথ চলতে পারে।

অভিজ্ঞ পাখিরা এদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় বলে যে ধারণা ছিলো তাও ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বাল্টিক উপকূলে একবার এক জাতীয় সারসের ওপর এ নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়েছিলো। অভিজ্ঞ সারসগুলো চলে যাওয়ার বেশ কিছু দিন পরে বাচ্চা সারসগুলোকে পায়ে আংটি বেঁধে ছেড়ে দেয়া হলো। এরা আগে কখনোই দেশান্তরে যায় নি। কিন্তু দেখা গেলো বাচ্চা সারসের দল তাদের চিরাচরিত আকাশ পথে উড়াল দিলো। এবং পেঁৗছে গেলো কৃষ্ণসাগরের তীরে। যেখানে ইতোপূর্বে সেই সারসের ঝাঁকটি এসেছিলো। সত্যি, অবাক কাণ্ড! পাখিদের নিয়ে আরো নানা তথ্য জানা গেছে। সাধারণত(ছোট পাখিরাই রাত্রিকালে বেশি দেশান্তরী হয়।) জলচর ও ডাঙার পাখিদের মধ্যে দেশান্তরের অনেক ব্যবহারিক পার্থক্যও আছে। যেমন(ডাঙার পাখিরা সমুদ্রের উপর দিয়ে যাবার সময় ভয় পায়। তাই অনেকে উঠে যায় উঁচুতে। আর পানির পাখিরা ডাঙায় নিচু দিয়ে উড়ে যেতে ভয় পায়।) পাখিদের এই দূরপাল্লার পাড়ি অসংখ্য বিপদে ভরা। এখানে থাকে পায়ে পায়ে মৃত্যু।

কোনো সময়েই একদলের সবাই গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না। অনেক বাধা আছে পথে। সব কিছু পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে এই যাযাবর পাখির ঝাঁক। দেশ থেকে দেশান্তরে। চলার পথে আক্রমণের শিকার হয় বাজপাখির। এ-ভাবে বাজের হাতে বেশ কিছু মারা পড়ে। ঝড়-বৃষ্টি ও তাপমাত্রার হঠাৎ অস্বাভাবিক পরিবর্তনও এদের ব্যাপক মৃত্যুর কারণ হয়। ১৯০৭ সালে মিনেসোটা অঞ্চলে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাখি মারা গিয়েছিলো তুষারপাতে। পাঁচ হাজার মৃত প্যারা-সিন পাখিকে ভাসতে দেখা যায় হুরন লেকের পানিতে ওই একই বছরে। এ-ছাড়াও ক্রমাগত চলার ক্লান্তিতেও মারা যায় অনেক পাখি। ডাক্তার কুইঙ্ক স্যাঙ্ক এক ডিসেম্বরের সকালে দেখতে পান ছোট পাখির একটি

ঝাঁক প্রাণপণ চেষ্টা করছে দূরের একটা জাহাজে পৌঁছতে। আগের রাতের ঝড়ে সমুদ্রের ওপর এরা ছিটকে এসেছিলো। সেদিন অল্প পরিমাণ পাখি জাহাজে যেতে পেরেছিলো। বাকিরা সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ে পড়ে মুহূর্তে মিলিয়ে যায় ক্লান্তিতে। রাতে-চলা পাখিদের সবচেয়ে বেশি বিপদ। তীব্র আলো এবং উজ্জ্বল রং দেখে এরা আকৃষ্ট হয়। আমেরিকার বিমান বন্দরে কিছুদিন আগে চড়া রংয়ের একটি দরজায় ধাক্কা খেয়ে সহস্রাধিক ওর্য়াবলার মারা গেছে। প্রতি বছর লাইট হাউ-সের তীব্র আলোয় আকৃষ্ট হয়ে মারা পড়ে পাখিরা। যাওয়া-আসার পথে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা আকাশ ছোঁয়া বড় বড় বাড়িগুলোও এদের মৃত্যু ঘটায়। এক রাতে কুড়ি হাজার পাখি মারা যায় আমেরি-কাতে। একটি টেলিভিশনের টাওয়ার তাদের মৃত্যুর কারণ। কিন্তু অবাক ব্যাপার হলো এরা এ বছর যেখানে বাধা পায় পরের বছর আর যায় না সে পথে দিয়ে। কিংবা গেলেও রাতের অন্ধকারেও এরা সামনের সেই বাধা অতিক্রম করে যায়।)

কোনো পাখি পরিব্রাজনকালে কতো উঁচু দিয়ে উড়ে যায় তা নিয়ে গবে-ষণা হয়েছে।(বেশির ভাগই পরিব্রাজনকারী পাখি তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে চলে। ছোট জাতের পাখিগুলো খুব নিচু দিয়ে উড়ে যায়। যেন সাগরের বুক ছুঁয়ে চলেছে। অবশ্য প্রয়োজনে অনেক উঁচুতেও উঠতে পারে। বারো হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ে চলে বুনোহাঁস আর পেলিক্যানের ঝাঁক।)

(দিন-রাতের দৈর্ঘ্য-পরিধি পাখির মস্তিষ্কের পিটুইটারি বা পিনীয়াল গ্রন্থির কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই ছোট দিনে পাখি অস্থির হয়ে উঠে।) আর এটাই দেশান্তরের মূল শক্তি। বিভিন্ন ভূমি-চিহ্ন পরি-ব্রাজনকালে পাখিরা ব্যবহার করে। নদী-নালা, পাহাড় বা জঙ্গল মনে রেখে দেশান্তর পথে চলা-ফেরা করে পাখিরা। এ-ছাড়াও আরো

তিনটি ক্ষমতা পাখিরা এ কাজে ব্যবহার করে থাকে। (সূর্য-কম্পাস, নক্ষত্র-কম্পাস ও অভ্যন্তরীণ ঘড়ি। দেহের এই ইন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে পাখিরা বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার সূক্ষ্ম উপাদান অনুভব করতে পারে, বুঝতে পারে সূক্ষ্ম তারতম্য।)

পৃথিবীর চৌম্বক ও মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র, বাতাসের গতিবেগ এবং বায়ুচাপের সামান্যতম পরিবর্তনও দেশান্তরী পাখিরা বুঝতে পারে। এ-সমস্ত কারণেই এদের কেউ কেউ অতি বেগুনী রশ্মি দেখতে পায়। যে কম কম্পন তরঙ্গে প্রবাহিত শব্দ (ইন্ফ্রাসাউণ্ড) মানুষ শুনতে পায় না তা অনেক পাখিই শুনতে পারে। মানুষ যে অতি বেগুনী রশ্মি দেখতে পায় না, অনেক পাখি তাও দেখতে পায়। তা এই সব জটিল ইন্দ্রিয়ের সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে পাখিদের দেশান্তরের দিক ও স্থান নির্ণয়ে এতটা নির্ভুল হতে পেড়েছে।)

পাখিরা যে নিয়মে দেশান্তরী হয় তার আর একটি পরীক্ষা করা হয়েছে। রাতের বেলা সত্যি সত্যি যাযাবর পাখিরা তারা বা নক্ষত্রের নিশানা দেখে চলে কি না। এটা পরীক্ষা করার জন্যে বিজ্ঞানীরা প্ল্যানেটেরিয়ামে সৃষ্টি করলেন কৃত্রিম আকাশ। তাতে সত্যিকার তারার মতো জ্বালানো হলো অসংখ্য তারা। তার ভেতর ছেড়ে দেয়া হলো রবিন পাখিদের। জার্মানীর পাখি এরা। তাই এদেরকে প্রথমে জার্মানীর যে শহরে তারা আছে সে শহরের আকাশ দেখানো হলো। পাখিরা নির্ভুলভাবে উড়তে শুরু করলো দক্ষিণ দিকে। যেখান দিয়ে গেলে তারা গিয়ে পৌঁছুবে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের গরম আবহাওয়ায়। কিন্তু এই সময়ই প্লানেটেরিয়ামের কৃত্রিম আকাশ ঘুরিয়ে সাইবেরিয়ার আকাশের ছবি ভাসিয়ে তোলা হলো। পাখিরা থমকে আবার তাকালো আকাশের দিকে। তাদের বহু যুগের গড়ে ওঠা অনুভূতিতে যখন বুঝতে পারলো ঐসব তারাদের অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং (পাখিরা আকাশের তারাদের সাথে সাথে নিজেদের দিক

পালটিয়ে নিলো।) দক্ষিণ দিক মনে করে উড়তে লাগলো পশ্চিম দিকে তারাদের সাথে। তার পর উত্তরে উড়ে চললো। পাখিরা কৃত্রিম আকাশের ফাঁকিটা একেবারে বুঝতেই পারলো না।

এ-সব দেখে পাখি বিজ্ঞানী ডক্টর জীউ স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে, রাত্রে যে-সব পাখি দেশান্তরে যাবার জন্যে ওড়ে তারা দিক ঠিক করে নক্ষত্রের অবস্থান থেকে। (কিন্তু আকাশ পরিষ্কার না থাকলে দিক ঠিক করতে ভুল করে।)

বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে জানা গেছে, (বিভিন্ন জায়গা ও বিভিন্ন সময়ে রাতের আকাশ কেমন থাকে এ সম্বন্ধে পাখিদের জন্মগত একটা গুণ আছে। এ গুণটি এরা কি ভাবে অর্জন করেছে তা কেউ জানে না।) তবে এটা যে তাদের বাঁচার জন্যে অনেক সুবিধে দিয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। (তাদের এই জ্ঞান বংশ পরম্পরা চলতে থাকে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যাযাবর পাখিরা পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র, উপকূল ইত্যাদিকে চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করে আসা-যাওয়া করে থাকে। কোনো কোনো পাখি দিনের সূর্য এবং রাতের বেলা তারাকে চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করে। কেননা মেঘলা দিনে বা মেঘলা রাতে যাযাবার পাখিদের দিকভ্রান্ত হতে দেখা গেছে।) কোন পথে চলা-ফেরা করবে এবং কোথায় যাবে এ-সব বাচচারা পিতা-মাতার কাছ থেকে জেনে নেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য বাচচারা স্বাধীনভাবেই গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারে রাস্তা চিনে। পাখি পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণার জন্যে পাখির পায়ে এলুমিনিয়ামের কিংবা হালকা ধাতুর আংটি পরিয়ে দেয়া হয়। পাখিটি নম্বর এবং প্রতিষ্ঠানের নাম খোদাই করা থাকে আংটিতে। এই সব পাখি পরবর্তীতে কেউ পেলে উক্ত ঠিকানায় যাতে খবর দিতে পারে।

(ইউরোপের এক যুবক নিতান্ত কৌতূহলবশত বাড়ির পাশের এক গাছে বসবাসকারী এক জোড়া সারসের একটি পায়ে নিজের নাম-ঠিকানা

খোদাই করে আংটি পরিয়ে দেয়। শীতকালটা সুদূর ভারতের বেনারসীতে কাটিয়ে সারসটি যখন ফিরে এলো তখন সেই আংটিটির সাথে অন্য আরেকটি আংটি ছিলো। বেনারস নিবাসী একটি ইংরেজ পারিবারের ঠিকানা লেখা ছিলো তাতে।) এ-ভাবে দু-পক্ষের অনেক বার্তা বিনিময়ের পর সেই ইংরেজ যুবকটির বিয়ে হয়ে। অভূতপূর্ব এই শুভ যোগাযোগটি ঘটিয়েছিলো একটি দেশান্তরী পাখি। (ঘটনাটি বিশেষজ্ঞদের চোখে ভালো লেগে গেলো। তারা পাখিদের গতিবিধির সঠিক তথ্য সংগ্রহের নির্ভুল প্রক্রিয়া হিসেবে এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করলেন।)

পৃথিবীব্যাপী পাখি বিশেষজ্ঞরা পাখিদের গতিবিধির খোঁজ-খবর রাখার জন্যে প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা ও সাংকেতিক নম্বর অঙ্কিত এলমুনিয়ামের তৈরি বিশেষ আংটি ব্যবহার করেন। আংটি পরিয়ে দেন পাখিদের পায়ে। চিহ্নিত পাখিটি পৃথিবীর যে অংশেই যাক কেন পর্যবেক্ষকদের হাতে পড়ুক বা শিকারিদের বন্দুকের গুলীতে প্রাণ হারাক তাতে ক্ষতি নেই। এই বিশেষ আংটিটি থেকে জানা সম্ভব পাখিটির ভ্রমণবৃত্তান্ত।(পৃথিবী অনেক দেশেই দেশান্তরী পাখিদের রহস্যময় তথ্য জানার জন্যে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে অনেক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ওয়াইল্ড লাইফ সার্ভিস' প্রতি বছর ৬ লক্ষ পাখিকে বিশেষ চিহ্নযুক্ত আংটি পরিয়ে থাকে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক আংটি পরানো পাখির পরবর্তিতে খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। কেননা বিভিন্ন দেশের শিকারিরা এই আংটিগুলো স্মারক চিহ্নের মতো সংগ্রহ করে অথবা ফেলে দেয় অজ্ঞতার দরুন। আমাদের দেশেও এই প্রবণতা কাজ করে বিশেষভাবে। আসলে একটু চেষ্টা করলেই পাখি-সম্পর্কিত পৃথিবীব্যাপী গবেষণা কাজে অংশ নেয়া যায় ধৃত বা মৃত পাখিদের আংটিগুলো যথা ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে। কেননা পাখি বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারটি পৃথিবীব এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত জুড়ে বিস্তৃত এবং আমাদের দেশটিও এর বাইরে নয়।

আমাদের বাংলাদেশে পাখির প্রজাতি আছে ৫৮০টি। এর মধ্যে ২০০ প্রজাতিই হলো দেশান্তরী পাখি অর্থাৎ শীত মৌসুমের পাখি। বাংলাদেশের শীতের পাখির ধারণা এসেছে মূলত হাঁস, রাজহাঁস এবং বলাকাদের আগমনের দিন-ক্ষণকে কেন্দ্র করে। শীতের অতিথিদের মধ্যে এরা সবার শেষে আসে। আবার ফিরেও যায় সবার আগে। অর্থাৎ নভেম্বর ডিসেম্বর মাসের দিকে এসে ফিরে যায় ফেব্রুয়ারি মার্চের দিকে। আমাদের দেশের পুরোপুরি শীতের পাখি বলতে হাঁসকে বোঝানো হয়। অক্টোবরের শুরুতে অথবা তারও আগে থেকে নদীর ধারে পুকুর পাড়ে বা পথের পাশে দু-চারটে বিভিন্ন ধরনের খঞ্জনা পাখি দেখা যায়। ধীরে ধীরে আরো অনেক ছোট-বড় পাখি এসে আমাদেব দেশের ঝোপ-ঝাড় মাঠ-ঘাট ভরে যায়।

(চলাচলের পথে পাখিটি কোথাও ধরা পড়লে পায়ের আংটি থেকে জানা যায় সে এসেছে কোথা থেকে। খবরটি তখন ঠিকানা মতো জানিয়ে দেয়া হয়। এমনি করেই পাখির শুরু থেকে শেষ অবধি যত জায়গা থেকে আংটির খোঁজ পাওয়া যায় সেই অনুযায়ী পাখির পথের নিশানা বের করা হয়।)

এ-ভাবেই জানা গেছে কোন পাখি কোন দেশ থেকে আমাদেব দেশে আসে। হাঙ্গেরী থেকে আসে জোয়ারী পাখি। লালশির হাঁস আসে বৈকাল হ্রদ, আমুদরিয়ার ধার থেকে। পশ্চিম রাশিয়া থেকে আসে সবুজ খঞ্জনা। শাদা সারস আসে পশ্চিম জার্মানী থেকে।

শীতের পাখিদের যাত্রা শেষ হয় সিংহল দ্বীপে গিয়ে। দেশান্তরী পাখির এই পথটি বোঝা গেছে ওদের চলাফেরা দেখে। বসন্ত ঋতু শেষে অর্থাৎ গরম পড়ার সাথে সাথে পাখিরা আবার ফিরে যেতে থাকে যে পথ ধরে এসেছিলো ঠিক সে পথ ধরেই।

এ-সব যাযাবর পাখিরা শীত নামার আগেই বাংলাদেশে আসতে শুরু করে। আস্তানা গড়ে দ্বীপ, সমুদ্র উপকূলও, নদীর চরে। বিল-ঝিল হাওড়ে। ছোট-বড় জলাশয়ে আর সুন্দরবন অঞ্চলে। ওরা আসে ছোট ছোট দলে অথবা ঝাঁক বেঁধে। বিচিত্র বর্ণের বিভিন্ন আকৃতির অসংখ্য পাখির কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে চারপাশ। ঝোপ-ঝাড় গাছপালা, ঘাসবন সব জায়গাতেই এরা বাসা বাঁধে। সোনা রোদের উষ্ণতায় সারা দিন এরা আনন্দে ডানা ঝাপটায়। পানিতে সাঁতার কাটে তর তর করে। বিভিন্নভাবে ভাব বিনিময় করে সঙ্গীদের সাথে। ছোট ছোট মাছ, ব্যাঙ, ঝিনুক, শামুক, পোকা-মাকড়, শস্যদানা খায় পরমানন্দে। তবুও এদের এই আনন্দে বাধ সাধে কিছু লোভী শিকারি। তাদের অত্যাচারে বারবার বাসা বদল করতে হয় পাখিদের।

বাংলাদেশে শীতের পাখিদের মধ্যে থাকে সাইবেরিয়া থেকে আসা কিছু পাখি। শীতের পাখি বলতে যাযাবর হাঁসদেরকেই বোঝে সবাই। অবশ্য রাজহাঁস এবং চখাচখি বাদ দিলে সব হাঁসই আসে সাইবেরিয়া থেকে। সাইবেরিয়া-বাংলাদেশ আসা-যাওয়াকে বিজ্ঞানীরা বিচার করছেন উত্তর-দক্ষিণ পরিব্রাজন বৃত্তি হিসেবে।

(আমাদের দেশের যাযাবর পাখিগুলো সাধারণত হিমালয় পর্বত, উত্তর ইউরোপ ও সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে এসে থাকে।) এ-সব যাযাবর পাখির মধ্যে খঞ্জনা আর বুনোহাঁস ছাড়াও থাকে ওয়ার্বলার, থ্রাস, ফ্লাইকেচারসহ অনেকেগুলো ছোট ছোট পাখি। কাদাখোঁচা এবং স্নাইপ-জাতীয় বেশ কিছুসংখ্যক জলচর ও উপকূলীয় পাখি কিছু বক, হাড়গিলা ইত্যাদি থাকে। তবে বুনোহাঁসদের দূর পাল্লার পাড়িই হচ্ছে সবচেয়ে বিস্ময়কর। আমাদের দেশে তেইশ ধরনের বুনোহাঁস দেখা যায়। তাদের ছ'টি ছাড়া আর সবাই যাযাবর। (বুনোহাঁসের ঝাঁক দিগন্ত পেরিয়ে কখনো ধনুকের মতো, কখনো একগাছি ফুলের মালার মতো, কখনো-বা

ত্রিকোণাকার নকশার মতো সারি বেঁধে ভেসে এসে বাংলাদেশের হাওড়-বিল আর নদীর চরে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

যাযাবর পাখিদের অবস্থান আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের। কিছু কিছু পাখি বাংলাদেশসহ সারা দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলংকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে পাড়ি জমায় অনেক পাখি। দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলংকা উড়ে যায়। তবে সরাসরি দক্ষিণ দিকে তারা অগ্রসর হতে পারে না। কেননা দক্ষিণে আর স্থলভাগ নেই। তাই তারা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিহার হয়ে নিজেদের গন্তব্যস্থলে চলে যায়। কয়েক ঘণ্টা অথবা কয়েক দিন পর্যন্ত বিশ্রামের জন্যে বাংলাদেশে অবস্থান করে উত্তর দিকে ফেরার সময়ও তারা বাংলাদেশে কিছু সময় কাটিয়ে যায়। আবার কিছু পাখি আছে যেগুলো অন্য রাস্তা ধরে দক্ষিণে যায়, আর ফেরার পথে বাংলাদেশে আসে। আবার এমনও হতে দেখা গেছে কিছু পাখি বাংলাদেশ হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে যায় কিন্তু উত্তর দিকে ফিরে যায় ভিন্ন পথ ধরে। সুতরাং কিছু যাযাবর পাখি, যারা শীতকাল এ দেশে থাকে। কিছু পাখিকে শীতের শুরু ও শেষের দিকে এবং কিছু পাখিকে শীতের প্রথম বা শেষের দিকে মাত্র একবার দেখা যায়।

বাংলাদেশে দেশান্তরী পাখিরা বেশি আসে হিমালয়ের পর্বতমালা ও তার আশেপাশের অঞ্চল থেকে। উত্তর-দক্ষিণে যাওয়া ছাড়াও পাখিরা পাহাড়ের বরফ ঘেরা উঁচু জায়গা থেকে নিম্নাঞ্চলে বা সমভূমি এলাকাতে নেমে আসে। আর দক্ষিণ গোলার্ধের পাখিরাও অপেক্ষাকৃত উষ্ণতার দেশে চলে আসে উত্তরের দিকে। কিছু পাখি উত্তর-দক্ষিণ দক্ষিণ-উত্তর বা উঁচু-নিচু স্থান পরিবর্তন না করে পূর্ব-পশ্চিমে আসা-যাওয়া করে। পূর্ব পশ্চিমে পরিব্রাজনকারী পাখিরা এ-দেশে আসে না। তবে থাইল্যাণ্ডের আংটি পরানো কিছু ওপেনবিলস্টর্ক বাংলাদেশে ধরা পড়েছিলো একবার। অবশ্য এ প্রজাতিটিকে আসল

পরিব্রাজনকারী পাখি বলে ধরা হয় না। তবে এই ওপেনবিলস্টর্ককে পূর্ব-পশ্চিমের যাত্রী ধরা হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে থেকে বাংলাদেশে কোনো পাখি আসে না। এ দেশে আসা পাখির মধ্যে বড় ধরনের দল হলো হাঁসের। এদের ২০ থেকে ২২টি প্রজাতি আসে এ দেশে। ৬টি প্রজাতি এ দেশে বারোমাস বাস করে। যাযাবর হাঁসের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ধূসর রাজহাঁস, গোলাপী রাজহাঁস, চখাচখি, শাচকা, চিতি হাঁস, লেঞ্জা, জিরিয়া হাঁস, বৈকাল হাঁস, নীলশির হাঁস, পাতারী হাঁস, পিঙ হাঁস, কালোহাঁস, বড় ভূতি হাঁস, বামুনিয়া হাঁস, লালশির হাঁস, পান্তামুখি হাঁস, ভূতিহাঁস, রাঙামুড়ি ও শিখাযুক্ত হাঁস।

অন্যান্য যাযাবর পাখিদের মধ্যে যাদেরকে সাধারণ মানুষ শীতের পাখি হিসেবে চিনতে পারে না তাদের সংখ্যা ১৫০ প্রজাতি। তাদের আসা-যাওয়াটা যেন নীরবেই শেষ হয়। এই চুপিসারে আসা পাখিরাই শস্য ক্ষেতের এবং বন-বাদাড়েব পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, সাপ, ইঁদুর, কাঠ-বেড়ালী, শশক প্রভৃতি খেয়ে ব্যাপক ফসল রক্ষা করে। শিকারি বাজ ও পেঁচার মতো বেশ কটি প্রজাতি এ-সময় আমাদের দেশে আসে। এবা হল ছোটো বাজ বা কেস্ট্রেট হেরিয়ার বারাখালভুলানী, জলারচিল প্রভৃতি। অন্যান্য শিকারি পাখিদের মধ্যে আসে বড় ঈগল, কালো ঈগল, চিত্রা ঈগল, বাজারড, ঘোযহক, স্প্যারোহক, ভুবন চিল, অসপ্রে বা মেছো ঈগল। এরা হলো সবাই দিবাচর। শর্টইয়ারর্ড আউল এবং বাদামী কাঠ পেঁচা হচ্ছে রাতের শিকারি পরিব্রাজনকারীর দলে।

পরিব্রাজনকারী অন্যান্য পাখিদের মধ্যে আছে—গগনবেড়, বড বক, বির্টান, শাদা গানিকজোড়, কানঠেঁাটি, জলকবুতর, গাঙচিল, বড় গুলিন্দা, ছোট গুলিন্দা, মঙ্গোলীয় জিরিয়া, জিরিয়া, কোদা খাঁচা, চ্যাখ্যা, শাদালেজী টিট্রিভ, হট-টি-টি, বাটান, বালু বাটান, জোবালী, লাল পা ও সবুজ পা পিউ, চা পাখি, গ্রীন পিজিয়ন প্রভৃতি।

গায়ক পাখিদের দলে আছে অনেকেই। আর আমাদের দেশে আসা যাযাবর পাখিদের মধ্যে গায়ক পাখির সংখ্যাই বেশি। ভরত, সাধারণ ও ডোরা কাটা আবাবিল, তিব্বতীয় এবং বাদামী কসাই পাখি, ঘাড় কালো হলদে পাখি, ধূসর ফিঙে, বিলেতি শালিক, মুসিক্যাপিনী, সিলভি আইনি, চারডিনী, ফ্লাক্যাচার, লাল বুক চটক, বাদামী, শাদা ভুরু, কালচে নীল বুক এবং আকাশী চটক বুশওয়ার্বলার, হীল ওয়ার্বলার, থ্রাস, থ্রাসহপার, রীড, প্যাডিফিল্ড, লীপ ফ্লাইক্যাচার ওয়ার্বলার প্রভৃতি গায়ক পাখিদের অন্তর্ভুক্ত। আকারে ছোট এ-সব পাখির গায়ের রং তেমন সুন্দর নয়। ঝোপ-ঝাড়ে ও বনে-জঙ্গলে বাস করার ফলে এরা কারো নজর কাড়ে না। তাই এদের সম্পর্কে আমরাও অজ্ঞ সব চেয়ে বেশি। খেয়াল করি সব চেয়ে কম।

আমাদের দেশে খাল বিল অজস্র। আর অবারিত মাঠ। যাযাবর পাখিদের থাকা এবং খাবার জন্যে বেশ সুবিধাজনক স্থান। চরাঞ্চলে উরি ঘাস খায় রাজহাঁসেরা। বিলে হাওরে যে সমস্ত হাঁস আসে তারা প্রায় সবাই নিরামিষভোজী। মাঝে মধ্যে মাছ, গুগলি, শামুক, জলজ পোকা-মাকড়, এরা খায়। তবে জলজ উদ্ভিদ মূল, ফুল-ফল এবং ঘাসের কচি ডগা এদের প্রধান খাদ্য।

কক্সবাজার সৈকতে দেখা মেলে মঙ্গোলীয় জিরিয়া বা ছোট জিরিয়াদের। এরা পোকা-মাকড় এবং কেঁচো খুঁজতে ব্যস্ত থাকে সৈকত এলাকায়। শত শত কাদাখোঁচাকে কাদার ওপর হেঁটে বেড়ানো কীট-পতঙ্গ পোকা-মাকড়, কেঁচো প্রভৃতি খুঁজে বের করে মহানন্দে খেতে যায় নদীর চরা, মোহনা, সমুদ্রতীর এবং সুন্দরবনের নদীর পাড়ে।

রাখালভুলানী বাজ বা হেরিয়ার ইঁদুর ঘাসফড়িং বা উরচুঙ্গা জাতীয় পোকা খায়। এরা ফসলের ক্ষেতের সামান্য ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ইঁদুরের চোখকে ফাঁকি দিয়ে অনেক উপরে স্থির হয়ে ডানা ঝাপটায়। তার পর

মাটি সরানোতে ব্যস্ত ইঁদুরকে ছোঁ মেরে তুলে আনে তাদের শক্ত থাবা দিয়ে। এ-ভাবে তারা গিরগিটি, পোকা-মাকড় এবং ছোট-খাটো সাপও ধরে খায়। চিত্র চিল, মাস হেরীয়ার, পেরীগ্রীন, ফ্যালকন ও কিছু ঈগল জলাশয়ের ধারে ধারে ঘুরে বেড়িয়ে নানা রকমের ছোট পাখি ধরে খায়। আখ, গম, ভুট্টা, ডালের ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে পোকা-মাকড় ধরে খায় লাল ও নীল গলা পাখি এবং রেডসটার্ট।

বাগানের কীট-পতঙ্গ, ঝোপ-ঝাড়ের পোকা-মাকড় ধরে খায় ফ্লাইক্যাচার, ওয়ার্বলার, কুকু শ্রাইখ থ্রাস ও ধূসর ফিঙে। কসাই পাখিরা মাঠ এবং ফসলের ক্ষেতে থেকে পোকা-মাকড় ধরে খায়। উড়ন্ত কীট-পতঙ্গ উড়ে উড়ে ধরে খায় আবাবিল এবং ডোরা আবাবিল। নিশাচর পেঁচারা বনে এবং দ্বীপাঞ্চলে ইঁদুর ও কাঠ বিড়ালী খায়। আর অসপ্রে খায় শুধু মাছ।

ভুবন চিলেরা আমাদের দেশে এসে বাসা বাঁধে ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর এবং মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আশেপাশের কড়ুই, দেবদারু, তেলশুরা ইত্যাদি গাছে বাসা বাঁধে। এদের সংখ্যা প্রায় ১২০০ মতো। শহরে ভুবন চিলের খাদ্য সংগ্রহের জায়গা হলো হাজারীবাগ ট্যানারী একালা ও কসাইখানা। ওসব জায়গা থেকে খাদ্য হিসেবে সংগ্রহ করে ছাগলের কান, শিং, মাথার চামড়া এবং খুর। সেপ্টেম্বরের দিকে এসে এরা ফিরে যায় মার্চের শেষ নাগাদ।

এ-ভাবেই প্রতিবছর যাযাবর পাখিরা আমাদের দেশে আসে। ফিরে যায়। তবে সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এ-সব অথিতি পাখিদের অধিকাংশ চতুর শিকারিদের হাতে ধরা পড়ে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতি বছর শিকারিদের হাতে আটকা পড়ে লক্ষ লক্ষ পাখি। তা ছাড়াও পাখিদের আগের নিরাপদ জায়গার পরিমাণও কমে আসছে দিন দিন। এ-সমস্ত দেশান্তরী অতিথি পাখিদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে। অতিথি

পাখিরা বাংলাদেশে বর্তমানে আনন্দ আর সন্ত্রাসের ভেতর কাটিয়ে চার-পাঁচ মাস পর চলে যায় স্বদেশের দিকে। যাবার আগে আকাশে অনেক ক্ষণ ধরে ঝাকে ঝাকে চক্কর দেয় আর করুণ স্বরে ডাকে। ওদের স্বজন হারানোর ব্যথায় তখন ভারি হয়ে ওঠে বাতাস।

দেশান্তরী পাখি শুধু আমাদের সম্পদ নয়, এটা বিশ্বের সম্পদ। এমন একটি সম্পদ যার সংরক্ষণে মানুষই বেশি উপকৃত হবে। এ-জন্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এদের প্রতি যত্ন নেয়া হচ্ছে। তৈরি করা হচ্ছে অভয় অরণ্য। ওদের নিরাপদে থাকার মতো জায়গা।

আমাদের দেশে আইন থাকা সত্ত্বেও অনেকে পাখি শিকার করে। কেউ জেনেই করে সৌখিনতার জন্য। আর কদল একরে না জেনে। বাংলাদেশের শহর-গঞ্জে, বিল-হাওরে শিকারিদের হাতে ধরা পড়া পাখি-গুলো অবাধে বিক্রি হয়। তাই এখন দরকার আমাদের সচেতনতার। পাখিদের প্রতি মমত্ববোধ জাগাতে হবে। তাদের প্রতি হতে হবে সহানুভূতিশীল। নইলে ওরা হারিয়ে যাবে। দিন দিন যে হারে কমছে ওদের আগমন সংখ্যা, একদিন হয়তো আর আসবেও না এ-দেশে। অভয় আশ্রয়ের অভাবে ওরা অবলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই ওদের জন্যে চাই একটি অভয় অরণ্য।

কতটি প্রজাতির পাখি পরিব্রাজনকারী তার সঠিক কোনো হিসেব নেই। ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের পাখিদের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগই পাখি দেশান্তরী হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের ১২০০ প্রজাতির মধ্যে ৩০০টি প্রজাতি দূর দেশ থেকে শীতকালে এখানে আসে। ৬৪ রকমের গায়ক পাখি আছে বৃটেনে অথচ তাদের মধ্যে ২২টি প্রজাতিই পরি-ব্রাজনকারী পাখিদের দলে।

অবলুপ্তির পথে

স্পেনের রাজকীয় ঈগল নামের এই অপরূপ পাখি এখন অবলুপ্তির পথে। ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে এরা। স্পেনের কাসেরেস প্রদেশ, কোতো দোনানা ন্যাশনাল পার্ক এবং পর্তুগাল মিলিয়ে রাজকীয় ঈগলের সন্ধান পাওয়া গেছে মোট যাট জোড়া। এদের নিরাপত্তার জন্যে কঠোর আইনের ব্যবস্থা করছেন স্পেন সরকার।

তবু এ পাখিদের বিপদের শেষ নেই। এরা বাস করে নিচু জমি এলাকায়। হালকা বনে। কিন্তু মানুষ উজাড় করে ফেলছে বনবাদাড়। বন কেটে বাড়ি তৈরি হচ্ছে। হচ্ছে ইউকেলিপটাসের চাষ। কীটনাশক ওষুধের বিষাক্ত ছোবল, শিকারীদের অত্যাচার—এমন অনেক কারণে স্পেনের রাজকীয় ঈগলদের জীবন এখন দুর্বিষহ।

এরাও হয়তো একদিন হারিয়ে যাবে আর সব হারিয়ে যাওয়া পাখিদের মতো।

ডোডো

ডোডো শব্দটির পর্তুগীজ ভাষার অর্থ হলো বোকা। স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন বলেই পাখিটির এমন নাম দিয়েছিলো পর্তুগীজরা। এরা এতোই বোকা ছিলো যে শত্রুদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার কোনো কৌশল জানতো না। ১৫০৭ সালে পর্তুগীজ নাবিকেরা ওদেরকে প্রথম দেখতে পায়।

তারা কুকুর ও বিড়াল নিয়ে গিয়ে ডোডো পাখি শিকার করতো। কুকুর-বিড়াল গুলো নষ্ট করে ফেলতো ওদের ডিম গুলো।

১৬৮১ সালের দিকে ডোডো পাখি অবলুপ্ত হয়ে যায়। নিজেকে বাঁচানোর কৌশল না জানা এবং স্থূলবুদ্ধি এদের অবলুপ্তির প্রধান কারণ।

মরিশাস দ্বীপে থাকতো ডোডো পাখিরা। অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যেতো না। ১৬৩৮ সালে একটি ডোডো পাখি লণ্ডনে দেখা গিয়েছিলো। পর্তুগীজ নাবিকেরা এগুলো ধরে নিয়ে আসতো ইউরোপে।

ডোডো পাখির আকার ছিলো বড় 'টার্কি' পাখির মতো ঠোঁটগুলো বেশ বড় বড়। ওজন প্রায় ২৩ কিলোমিটার। পা দুটো ছিলো খুব খাটো। আর ডানাও বেশ ছোট। ফলে এরা উড়তে পারতো না।

ইংল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের অনেক যাদুঘরে ডোডো পাখির হাড় ও কংকাল সংরক্ষিত আছে। মরিশাস থেকে সংগ্রহ করে ডোডো পাখির হাড় থেকে নকশাগুলো তৈরি করা হয়েছে।

অবলুপ্ত এই পাখি সম্পর্কে পাখি বিজ্ঞানীদের অভিমত, একমাত্র মরিশাসেই এই বোকাটে ডোডো পাখি পাওয়া যেতো।

মোয়া

আজ থেকে কয়েক শত বছর আগে নিউজিল্যাণ্ডে এক প্রকার পাখি ছিলো। এদের মতো সুউচচ, কদাকার এবং ওজনবিশিষ্ট পাখি আজ পর্যন্ত কোথাও দেখা যায় নি। পৃথিবীর এই অবলুপ্ত বৃহৎ পাখিটির নাম মোয়া। উট পাখির চাইতেও এরা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ওজনে বেশি ছিলো।

খৃষ্টীয় দশম শতকের দিকে নিউজিল্যাণ্ডে প্রচুর দেখা যেতো মোয়া পাখিদের। ভীষণ ভয়ংকর এই পাখির মানুষকে খুনলে খাওয়ার মতো শক্তি তাদের ছিলো। নিউজিল্যাণ্ডে মানুষ স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করলে

কয়েক শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে মোয়া পাখি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৮৬০ সালে এই ভয়ংকর পাখিটিকে শেষ বারের মতো দেখা গিয়েছিলো।

মোয়া পাখি কি সত্যি পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে? মোয়া পাখির চিহ্ন খুঁজে বেড়াচ্ছেন পাখি বিজ্ঞানীরা। জাপানী টেলিভিশনের একদল অনুসন্ধানী ক্যামেরাম্যান খুঁজে ফিরেছেন মোয়া পাখি। একটি জীবন্ত মোয়ার ছবি তোলা যায় কিনা তাঁরা চেষ্টা করছেন। (নিউজিল্যাণ্ডের আর এক প্রকার পাখি 'টাকাহে' পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে ধরে নেয়া হয়েছিলো। কিন্তু সম্প্রতি এই 'টাকাহে'কে আবিষ্কার করা গেছে ফিওর্ডল্যাণ্ডে। এবারও আশা করা হচ্ছে, একশ আঠারো বছর আগে শেষ দেখা পাখি মোয়ারও দেখা মিলতে পারে এই ফিওর্ডল্যাণ্ডের অরণ্যে।) জীবিত পাখি যদি নাও দেখা যায় অন্তত ডিমের খোসা বা পালক পাওয়া গেলেও পরিশ্রম বৃথা যাবে না।

সম্প্রতি মোয়া পাখির হাড় পাওয়া গেছে অরণ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে। এ পর্যন্ত মোয়াপাখির ত্রিশটি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। 'ডিনোরসিস ম্যাক্সিমাস' সব চেয়ে বড়টির নাম। উচ্চতায় ১২ ফুট।

এক সময় খুব দাপটের সাথে নিউজিল্যাণ্ডে বাস করতো মোয়া পাখিরা। মানুষ কিংবা কোনো চতুষ্পদ প্রাণী ছিলো না এখানে। মোয়ার হিংস্রতার জন্যে কেউ টিকতে পারতো না। মোয়াই ছিলো নিউজিল্যাণ্ডের রাজা।

মোয়া পাখির ওড়ার প্রয়োজন হতো না। পায়ে হেঁটেই চলতো। প্রচুর ঘাস ও গাছের কচি ডালপালা খেতো। মোয়ার খাদ্য ছিলো একটি হাতির খাদ্যের সমান। নিজেরা বাসা বাঁধতো না কোনো সময়। বড় বড় গুহায় বাস করতো। পলিনেসিয়া থেকে প্রথম মানুষ এখানে এসে বসবাস শুরু করে দশম শতকে। আর তখন থেকেই এরা হারিয়ে যেতে

থাকে। একটি মোয়া শিকার করলে অনেক লোকের বেশ কয়েক দিন চলে যেতো। আর এ-ভাবে শিকারিদের কবলে পড়ে এরা অবলুপ্ত হয়ে যায়।

ক্যাণ্টারবেরি মিউজিয়ামের কিউরেটার দক্ষিণ দ্বীপের পার্বত্য অঞ্চল থেকে এক হাজার মোয়ার হাড়গোড় খুঁজে পেয়েছেন। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার যে মোয়া পাখির যে সকল হাড় পাওয়া গেছে তার ভেতরে পাখা বা ডানার কোনো হাড় নেই। বুকের যে হাড়টি পাখিকে উড়তে সাহায্য করে সে ধরনের হাডও পাওয়া যায়নি। এ থেকেই পাখি বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন মোয়া পাখি উড়তে জানতো না।

অবলুপ্ত এই মোয়া পাখি আজো আমাদের কাছে এক বিস্ময়। এক রহস্য।

সাইবেরিয়ান সারস

'ক্রেন' বা সারস গোষ্ঠীর পাখি একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকা, নিউ-জিল্যাণ্ড ছাড়া পৃথিবীর সব অঞ্চলে অন্তত চৌদ্দটি ভিন্ন প্রজাতি দেখা যায়। এর মধ্যে দেশান্তরী আবার দেশান্তরী নয়-যেমন আমাদের দেশের সারস, এমন সারসও রয়েছে। এরা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। রাশিয়াতে এদেরকে বলে 'স্টার্ক'। বৈজ্ঞানিক নাম 'গস ল্যুকোগেরানাস'। তবে সবার কাছে এরা 'সাইবেরিয়ান হোয়াইট ক্রেন' বা শুধু 'সাইবেরিয়ান ক্রেন' বা সারস নামেই বেশি পরিচিত। উত্তর আমেরিকাতে এই গোষ্ঠী পাখির যে জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তা থেকে এদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে জানা যায়। এদের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবীতে এসেছিলো অতি প্রাচীন কালে। মানুষের আসার অনেক আগে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে প্রাদি নতুন যুগ বা 'ইওসিন' যুগেই এরা পৃথিবীতে বসবাস শুরু করেছে।

সুন্দর বৃহদাকার পাখি—সাইবেরিয়ান ক্রেন বা সারস। সরু লম্বা লম্বা ঠ্যাং। দাঁড়ালে উচ্চতা প্রায় চার ফুট হয়। সমস্ত শরীর বরফের মতো ধবধবে শাদা পালকে মোড়ানো। ডানার শেষ প্রান্তে কালোর ছোপ। উজ্জ্বল হলুদ চোখ। পালকবিহীন মাথার রং লাল।

সব কিছুর সমন্বয়ে অদ্ভুত সৌন্দর্য রয়েছে এই সারস পাখিদের। অন্যান্য সারসদের চেয়ে এদের ঠোঁটই সব চেয়ে লম্বা। এই লম্বা ঠোঁট দিয়ে এরা জলার কাদার নিচ থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জলজ ঘাস, মূল খুঁজে খায়। আর খায় ছোট সরীসৃপ, ব্যাঙ, পোকামাকড় ও ছোট মাছ।

সাম্প্রতিক কালে অনেক পাখির মতো এই প্রজাতির পাখিরাও আজ অবলুপ্তির পথে চলেছে। দুই দশক আগে এদের সংখ্যা ছিলো দুই হাজারেরও বেশি। বর্তমানে এদের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র আড়াই শোটিতে। ক্রেন গোষ্ঠী পাখির সব প্রজাতির মধ্যে সাইবেরিয়ান সারসের সংখ্যা সব চেয়ে কম। এবং আরো কমে যাচ্ছে দিনে দিনে। তাই পক্ষীবিদরা বর্তমানে চিন্তিত। কি ভাবে এদের রক্ষা করা যায় সে ব্যাপারে গবেষণা করছেন তাঁরা।

সাইবেরিয়ান সারস দেশান্তরী হয়ে আমাদের দেশে আসছে প্রাচীন কাল থেকে। ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এরা কবে থেকে এই দেশে আসতে শুরু করেছিলো তার ইতিহাস সঠিকভাবে জানা নেই। তবে এদেরকে আর আগের মতো আসতে দেখা যায় না। দুর্লভ হয়ে উঠেছে এরা।

সাইবেরিয়ান সারস একবার জোড়া বাঁধলে সারা জীবন যুগলবন্দী হয়েই থাকে। এরা অত্যন্ত ধীরগতিতে বংশবৃদ্ধি করে। কারণ ডিম দেবার ক্ষমতা এদের সীমাবদ্ধ। বসন্তকালের শেষ দিকে হালকা সবুজের ওপর হালকা খয়েরি ছিটেঅলা দুটি ডিম পাড়ে। ত্রিশ দিন পর

ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। শেষ পর্যন্ত একটি বাচ্চাই বড় হয়। অন্যটি হয় মরে যায় অথবা অন্য কোনো প্রাণী ওটাকে মেরে ফেলে। এদের সংখ্যা সীমিত হবার এটাও একটা বড় কারণ। আড়াই মাস পরে বাচ্চা সারস উড়তে শেখে।

পুরনো বাসা ব্যবহার নিয়ে এরা খুব রক্ষণশীল। বছরের পর বছর একই বাসা ব্যবহার করে। ডিম দেবার আগেই খড়-কুটো দিয়ে মাটিতেই বাসা বাঁধে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ডিমে'তা দেয় এবং বাচ্চা বড় করে তোলার দায়িত্ব পালন করে।

সাইবেরিয়ান সারস ষাট বছর পর্যন্ত বাঁচে। বর্তমানে এদের বিচরণ ক্ষেত্র ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। আর সংখ্যায় কমছে এরাও। চোরা শিকারিদের হাতে পড়ে মারা যাচ্ছে। যাযাবর জাতিরা এদের ধরে খেয়ে ফেলছে এস্টাডা হ্রদ থেকে।

দেশান্তরী হবার সময় বিপদে পড়ছে বিভিন্ন রকমের। বিভিন্ন কারণে এই সারসের পৃথিবীতে টিকে থাকা নানা সমস্যায় জর্জরিত। আশঙ্কা করা হচ্ছে প্রকৃতিতে বহু সমস্যার সাথে মোকাবেলা করে এরা হয়তো টিকে থাকতে পারবে না। তাই কৃত্রিম উপায়ে এদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্যে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কয়েক বছর থেকে সাইবিরিয়ান সারসের ডিম তাদের বাসা থেকে নিয়ে মস্কো ও লণ্ডনের পথে উইন্সকন্সিনে আন্তর্জাতিক ক্রেন ফাউণ্ডেশনে কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চা তোলার জন্যে পাঠানো হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক ক্রেন ফাউণ্ডেশনের জার্মান শাখাতেও সাইবেরিয়ান ক্রেনের ডিম সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে বাচ্চা তোলার জন্যে।

কিছু দিন আগে সাইবেরিয়ান ক্রেন সম্পর্কে কিছু আশাব্যঞ্জক কথা বলেছেন একজন চীনা বিজ্ঞানী। চীন দেশের সাথে দীর্ঘকাল যাবৎ

বাইরের পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক তথ্যের আদান-প্রদান ছিলো না। এর ফলে সাইবেরিয়ান সারসের যে বড় ঝাঁকটি শীতে সাইবেরিয়া ছেড়ে চীন দেশে দেশান্তরী হয় তার সঠিক তথ্য জানা যায় নি। ১৯৫০ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত এক পাখি সংরক্ষণ আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে চীনা বিজ্ঞানী এদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেন।

প্রায় ৫০ বছর আগের তথ্য থেকে জানা যায় যে, সাইবেরিয়ান সারসের একটি ঝাঁক ইয়াং ঝি এবং লাখোয়াথা নদীর অববাহিকায় শীত কাটাতে আসতো। শীতকালে চিয়াং সি প্রদেশের পয়াং হ্রদের পশ্চিম তা-পু-ছার অঞ্চলে প্রথম ১০০টি সাইবেরিয়ান সারস দেখা যায়। ঐ অঞ্চলে দেখা যায় ৯১টি।

তা-পু-ছার অঞ্চল থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে সুন সান অঞ্চলে আরো ৫০টি সাইবেরিয়ান ক্রেনকে শীত কাটাতে দেখা যায়।
চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ২৩০টি সাইবেরিয়া ক্রেন দেখা গেছে। এটাই এদের সবচেয়ে বড় দেশান্তরী ঝাঁক। এতো সংখ্যায় সাইবে-বেরিয়ান সারস আর অন্য কোথাও শীত কাটাতে যায় না।

সাইবেরিয়ান ক্রেন অক্টোবরের মাঝামাঝি সাইবেরিয়ান থেকে শীত কাটাতে দেশান্তরী হয় এবং এপ্রিল-মে মাসের মাঝামাঝি সাইবেরিয়াতে ফিরে আসে।

ধীরে ধীরে এরা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে নানা প্রতিকূলতার জন্যে। এদের শেষ ভরসা এখন মানুষের দয়া। শুভবুদ্ধি ও অনুকম্পার ওপরই নির্ভর করবে এই ক্ষয়িষ্ণু সীমিত প্রজাতি পৃথিবীতে টিকে থাকবে কি না।

বিলুপ্ত পাখি

বাংলাদেশ থেকে যে দুটি পাখি চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে তা হলো লালশির বা পিঙ্কহেডেড ডাক এবং ময়ূর বা পি-ফউল।

লালশির

প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে দেশের হাওর এবং চির সবুজ বন এলাকায় কিছু লালশির ছিলো বলে অনুমান করা হয়। পাখিটি ভারতের বাইরে অন্য কোথাও ছিলো না। সেখানে এটা সর্বশেষ দেখা যায় ১৯৩৫ সালের জুন মাসে। শেষ দেখার খবর এসেছিলো বিহার রাজ্যের দারভাঙা জেলা থেকে। ধরে নেয়া হয় বাংলাদেশে এটি ছিলো। তবে এ পাখি কেউ দেখেছে এমন নজীর নেই।

ময়ূর

এখনো হাজার হাজার ময়ূর ভারতে বাস করলেও বাংলাদেশের প্রকৃতিতে একটি ময়ূরও বেঁচে নেই। হিমালয়ের ১৮০০ মিটার উচ্চতা থেকে দাক্ষিণাত্যের কন্যা কুমারী, শ্রীলংকা এবং বাংলাদেশে পাওয়া যেতো ময়ূর। বর্তমানে এ-দেশে একটিও নেই। ময়ূর যমুনার পূর্ব দিকে ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলা অবধি বিস্তৃত ছিলো। সর্বশেষ ময়ূর দেখা গিয়েছিলো ঢাকা জেলার শ্রীপুরের শালবন রাথুরাতে, সেই আশি দশকের গোড়াতে। আমি নিজে খোঁজ করে ময়ূর পাই নি।

গত দু-তিন দশকে দেখতে দেখতে যে-সব পাখির সংখ্যা কমে এলো তার মধ্যে প্রথমেই চোখে ভাসে দিনের পাখি, রাতের শিকারী পাখি, ময়ূর গোত্রীয় পাখি, হাড়গিলা এবং হাঁসের ছবি।

শিকারী পাখির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শকুনের সংখ্যা যে খুবই কম এটা গ্রামের যে-কোনো লোকই বলে দেবে। গেলো এক দশকে আমার চোখে রাজশকুন পড়ে নি। অন্য কেউ দেখেছেন বলেও আমার জানা নেই। তবে ভারত সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে কদাচ রাজশকুন দেখা যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন শত-সহস্র মৃত মানুষ ও হাজার হাজার গরু খেতে শকুন বা হোয়াইট ব্যাকড ভালচার এলো না, তখনি দেশের জনগণ বুঝলেন শকুনের সংখ্যা কমেছে। বিরল হয়ে আসছে শঙ্খচিল, মাছ মোরাল বা উখাস, কুড়া বা বউল, ঈগল পাখি, বাজ এবং ফেলকন।

রাতের শিকারী পাখিরা পেঁচা বলে পরিচিত। গ্রামের বাড়ি-ঘর, ঝোপ-ঝাড় মুক্ত হবার ফলে পেঁচার সংখ্যা কমে আসছে। লক্ষ্মীপেঁচা সম্ভবত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাতি। ভূতম এবং হুতম পেঁচার অবস্থাও তদ্রূপ। ময়ূর গোত্রীয় পাখির মধ্যে গত এক দশকে কয়েক প্রজাতি তিতি, বর্মী ময়ূর এবং কাট ময়ূরের সংখ্যা কমেছে। বর্মী ময়ূর বিলীন হয়ে গেছে বলাই ভালো। এক-দুটি নমুনা এখনো রংখিয়াং এবং সাঙ্গু মাতা মুহুরী রিজার্ভ বনে থাকতে পারে। কালো তিতিরের শেষ নমুনাটি ১৯৭১ সালে প্রাণিবিদ্যা বিভাগে আনা হয় ঢাকার কাছে সাভার থেকে। শালবন থেকে ময়ূর হারিয়ে গেছে। বন মোরগ দিনের পর দিন কমছে। মধুরা, সুন্দরবন অবধি বিস্তৃতি লাভ করে নি। বন মোরগ অবশ্য পৌঁছেছে ওখানে।

হাড়গিলা, মদনটাক এবং মানিকজোড় দু দশক আগেও গ্রামে-গঞ্জে দেখা যেতো। এখন এ তিনটি প্রজাতি বেশ বিরল। হাঁসের মধ্যে বাগিন্দা, বাদি হাঁস এবং বোঁচা হাঁস বা কোম্বডাক সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গেলো

দশকগুলোতে। এক সময় বাদি হাঁসের বিস্তৃতি ছিলো সব চিরসবুজ বনে। এখন কয়েক জোড়া বেঁচে আছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার পাবলা খাল ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার গিভিট গাছ সম্পন্ন এলাকায়। অন্য সব যায়গা থেকে হারিয়ে গেছে বাদি হাঁস। বোঁচা হাস সিলেট-মোমেনশাহীর হাওরে এবং রাজশাহীর চর ও বিলে ছিলো। এখন কদাচ সিলেটের হাওরে দেখা যায়। সারস পাখি কখনো খুব বেশি সংখ্যায় এ-দেশে ছিলো না। তবে উত্তরবঙ্গে এবং দেশের হাওর এলাকায় মাঝে-মধ্যে দেখা যেতো। কয়েক বছর আগে ঠাকুরগাঁও মহকুমায় বাচ্চাসহ একজোড়া সারস দেখা যায়। সেটা এখন চিড়িয়াখানায় আছে।

ডাহুক পাখি বা বেঙ্গল ফ্লোরিকান এখন কোথায় যে বেঁচে আছে বলা কঠিন। তবে কয়েক যুগ আগে শনের বন সমৃদ্ধ এলাকায়, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ডাহুক ছিলো। সংখ্যা দ্রুত কমছে নাশড, ফিনফুট, হরিয়াল, কোড়া, ধনেশ পাখি, বৃহদাকার কাঠ ঠোকরা, কথা-বলা ময়না পাখি এবং নীল টুনির।

পাখি পর্যবেক্ষণের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রখ্যাত পাখি বিজ্ঞানী সলিম আলী বলেন, "এটা বেশির ভাগ নির্ভর করে নিজের উদ্যোগ ও উৎসাহের ওপর। আমি বিশেষত পাখিদেরকে প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখতেই বেশি পছন্দ করি—কখনও বন-জঙ্গলে, কখনও জলাভূমিতে, কখনও-বা মরুভূমিতে। তারা কি ভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয় সেটাই খুব মজার ব্যাপার। ঠিক তেমনি তাদের রয়েছে বৈচিত্র্যময় অভ্যাস আর খাওয়া-দাওয়া। পাখিরা ফল খায়, বীজ ছড়িয়ে বেড়ায় এবং তার মাধ্যমে সমাজে বিরাট অবদান রাখে। কি ভাবে এতোসব বিষয় পরস্পর যুক্ত হয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, কি ভাবে প্রাণীরা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ায় এবং কি ভাবে পরিবেশ তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে—এ-সবই আমার মূল কৌতূহলের বিষয়"।

খৈরি

লম্বা ১৫ ইঞ্চি। কোচ বকের মতো দেখতে। ঝাঁকড়া ঝুঁটিসহ মাথায় ধূসর মেটে ও বাদামী রং। গায়ের পালক মেটে রঙের। চিবুক, গলা শাদাটে। তার ওপর লম্বা লম্বা টান নেমে এসেছে বুকের ওপর দিয়ে। বুকের দু পাশে ডানার পালক কালো এবং হালকা ধূসর। ঠোঁট, পায়ের রং সবুজে হলুদে মেশানো। এই হলো খৈরি পাখি। এটি অনেক জায়গায় লাল বুক খয়েরি বক বলে পরিচিত।

খৈরি একা একাই থাকে। নলখাগড়া ঝোপে ছুটোছুটি করে। মাছ, ব্যাঙ এবং অন্যান্য কীট-পতঙ্গ ধরে খায়। সাধারণত চুপচাপ থাকে। বসন্তকালে ডাকে কোক কোক-এক-এক-এক-এক-গুক-গুক।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশে, মালয়েশিয়া, ফিলি-পাইন, সানডা, সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জ, চীন, সিংহল, আন্দামান, নিকোবর, মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জে বসবাস করে খৈরি। জলাভূমির ওপর নির্ভর করে তার অবস্থান।

লাল কাক

গাছপালার ভেতরে লুকোনো থাকে শরীর। লম্বা গলা পাতার ফাঁক দিয়ে বের করে দেয়। চারদিক দেখে। হঠাৎ করে দেখলে সাপ মনে হবে ওটাকে। আসলে এটা একটা পাখি। লাল কাক।

ঘন শরবনের আশেপাশে থাকে লাল কাক। অসম্ভব কৌতূহলী এরা। শালবনের লম্বা ডালে পাতার আড়ালে বসে থাকে।

কীট-পতঙ্গ, ব্যাঙ, মাছ, ছোট ইঁদুর ইত্যাদি লাল কাকের প্রধান খাদ্য। তবে সুযোগ পেলে ছোট পাখিও শিকার করে। অন্যান্য কাকের মতোই এর কর্কশ গলা। সুন্দরবনাঞ্চলে বেশি দেখা যায় এদের।

বাদি হাঁস

বাদি হাঁসের আরেক নাম ডোরাশির রাজহাঁস। লম্বায় ৩০ ইঞ্চি। শাদা মাথার ওপর এক চোখ হতে অন্য চোখ পর্যন্ত একটি কালো ডোড়া চওড়া দাগ। আর একটি অল্প ছোট ডোড়া ঘাড়ের ওপর ঠিক প্রথম ডোরার নিচেই। ঘাড়ের পাশে শাদা রেখা। তার পেছনের অন্যান্য অংশ পিঙ্গল। গলার সামনে অংশ ধূসরাভ পিঙ্গল। বুকের রং ধূসর। বুকের দু পাশে পিঙ্গল এবং তলার বাকি পালক শাদা। ডানার মাঝের কয়েকটা পালক ঘন পিঙ্গল। বাকি সমস্ত পিঠের রং ধূসর বর্ণের। ঠোঁট হলদে। ঠোঁটের অগ্রভাগ কালো। পা দুটোও হলদেটে।

ধানের ডগা, গেঁড়িশামুক, কচি জলজ আগাছা, জলজ কীট, সরীসৃপ ইত্যাদি বাদি হাঁসের প্রধান খাদ্য।

লাডাক, মধ্য এশিয়ার ভিয়েনশান, কোকনর এলাকায় বাদি হাঁস প্রচুর দেখা যায়। শীতে আসে আমাদের দেশে অতিথি পাখি হিসাবে।

পেঙ্গুইন

এক মজার পাখি পেঙ্গুইন। ডিম পাড়ার সময় হলেই সব ঝাঁকে ঝাঁকে চলে আসে এ্যাণ্টারটিকা মহাদেশের উপকূলে। স্ত্রী-পেঙ্গুইন একটা বা দুটো ডিম পাড়ে। ডিম দেবার আগে বরফ খুঁড়ে গর্ত তৈরি করে নেয়। ডিম পাড়ার সাথে সাথে ডিমকে দু পায়ের মাঝখানে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে খুব কৌশলে বুকের নিচে নিয়ে আসে। আর বসে বসে তা দেয়। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে বেড়ানোর সময়ও ডিমকে এ-ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে। বাচ্চা ফুটে বড় না হওয়া পর্যন্ত পুরুষ-পেঙ্গুইন স্ত্রী-পেঙ্গুইনকে খাবার এনে দেয়।

পেঙ্গুইনের উচ্চতা ১ থেকে ৪ মিটার। এরা সবাই দক্ষিণ গোলার্ধের বাসিন্দা। প্রায় সতেরো রকমের পেঙ্গুইন রয়েছে পৃথিবীতে।

পেঙ্গুইনরা পাখি হলেও কিন্তু উড়তে পারে না। মানুষের মতোই দুপায়ে হেঁটে হেঁটে চলে। শাদা রংয়ের বুক আর কালো রংয়ের পিঠের জন্যে দূর থেকে দেখায় যেন কালো কোট পরা উকিলের দল। এদের প্রধান খাদ্য চিংড়ি জাতীয় ক্রীল। সমুদ্রের উপর খাদ্য নির্ভর বলেই পেঙ্গুইনরা সাধারণত কুমেরু মহাদেশের তীর ঘেঁষেই থাকে।

অস্ট্রিচ

অস্ট্রিচ বা উটপাখি এক অদ্ভুত পাখি। প্রধানত আফ্রিকায় এদেরকে বেশি দেখা যায়। আকারের দিক থেকে এরা পৃথিবীর সব চেয়ে বড় পাখি। অস্ট্রিচ প্রায় ১৩০ কিলোগ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। উচ্চতা ২·৫ মিটার। ছোট দুটি ডানা আছে। দৌড়োবার সময় এই ডানা দুটি দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। অস্ট্রিচ উড়তে পারে না।

পুরুষ-অস্ট্রিচের পালকের রং কালো কিংবা ঘন বাদামী হয়ে থাকে। এদের পায়ের পাতা শাদা। স্ত্রী-অস্ট্রিচের পালকের রং হয় ফ্যাকাসে, ততো উজ্জ্বল নয়। পালকের আকার পুরুষের তুলনায় ছোট।

অস্ট্রিচের পায়ের পাতা বেশ লম্বা। দুটো করে আঙুল থাকে পায়ের পাতায়। পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত দৌড়বাজ পাখি। ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার গতিতে দৌড়াতে পারে এবং না থেমে একই গতিতে ১ কিলোমিটার পর্যন্ত ছুটতে পারে।

অস্ট্রিচের মাথা ও লম্বা গলায় ছোট ছোট অল্প পরিমাণ লোম থাকে। পালকগুলো বেশ চমৎকার দেখতে। কিন্তু খুব সহজেই উপড়ে ফেলা যায়। এতে অবশ্য কোনো অসুবিধা হয় না অস্ট্রিচদের। কারণ প্রতিবারই পালক উপড়ানো স্থানে নতুন পালক গজায়। এরা মিষ্টি সুরে ডাকতে পারে না। তীক্ষ্ণ শিসের মতো কর্কশ শব্দ করতে পারে শুধু।

অস্ট্রিচ যেমন বড় পাখি তেমনি এদের ডিমও সবার চেয়ে বড়। ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১২ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার ব্যাস হয় একেকটা ডিমের। অনেকগুলো স্ত্রী-অস্ট্রিচ মিলে প্রথমে একটা গর্ত খোঁড়ে। সেখানে ডিম দেয় তারা। ডিমে তা দেয় পালা করে। রাতের বেলা তা দেয় পুরুষ-অস্ট্রিচ।

খাবার ব্যাপারে অস্ট্রিচ খুব লোভী পাখি। কোনো বাছ-বিচার নেই। সব ধরনের খাবার খায়। ঘাস-পাতা, শস্য-কণা, ফল মূল এদের প্রধান খাদ্য। তবে মজার ব্যাপার হলো এরা পাথর খায়। লোহা খায়। এবং খায় আরো অনেক পাথর ও লোহা জাতীয় শক্ত পদার্থ। বিভিন্ন খাদ্যকে হজম করার জন্যে এরা পাথর ও লোহা খেয়ে থাকে।

বার্ড অব প্যারাডাইস

স্বর্গীয় পাখি বা বার্ড অব প্যারাডাইস। অপূর্ব ভঙ্গিতে পুরুষ পাখি নাচতে পারে। নাচের সময় চওড়া ডানা দুলুনিতে চমৎকার শিসের মতো আওয়াজ হয়। পাখা দুটোকে একবার সামনে একবার পেছনে ঘুরিয়ে নাচতে থাকে এরা। মাথাটি ডানে বায়ে সামনে পেছনে দোলায় নৃত্যের তালে তালে।

কমলা, সবুজ, বাদামী, হলুদ আর লাল রংয়ের ছিট থাকে পাখার পালকে। চমৎকার দেখতে বলেই এর নাম হয়েছে বার্ড অব প্যাডাইস। সবচেয়ে দেখতে সুন্দর হলো রাজা স্বর্গীয় পাখি।

অস্ট্রেলিয়া এবং নিউগিনিতে বার্ড অব প্যারাডাইস বেশি দেখা যায়।

সমুদ্র টিয়া

সমুদ্র টিয়া বা পাফীন কানাডার উত্তর উপকূলে এবং এ্যালাস্কার উপকূলে দেখা যায়। আইসল্যাণ্ড ও উত্তর স্কানডিনাভিয়া অঞ্চলেও এরা বাস করে।

এদের ঠোঁটটি বেশ চমৎকার। বেশ উঁচু এবং মোটা ঠোঁটের ওপর রয়েছে রংধনুর মতো চারটি রংয়ের প্রলেপ। গোড়ার দিকে ঘন হলুদ রংয়ের। তার পর নীল এবং কমলা। ঠোঁটের ডগায় আছে লাল ডোরা কাটা।

উপকূলীয় পাহাড়ী এলাকায় এরা ঝাঁক বেঁধে বসবাস করে। মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে বাসা বানায়। ডিম পাড়ে প্রায় দুই মিটার সুড়ঙ্গের ভেতরে। এদের সমস্ত শরীর ছাই রংয়ের লোমে আবৃত। বুকের নিচে খানিকটা শাদা। পা দুটোর রং লাল।

সমুদ্র টিয়ার প্রধান খাদ্য মাছ।

সেক্রেটারি বার্ড

সেক্রেটারী বার্ড সাবস পাখির বংশধর। সাপ এদের চিরশত্রু। এদের মাথার পাশ দিয়ে কতগুলো পালক এমনভাবে আছে দেখলে মনে হয় কোনো লোক কানে পালকের কলম গুঁজে বসে আছে। সেই জন্য এদের নাম হয়েছে সেক্রেটারি বার্ড।

শিকারী পাখি সেক্রেটারি বার্ডের বিরাট দুটো লম্বা পা আছে। আর আছে বাঁকানো ভাঙা একখানা ঠোঁট।

এদের প্রিয় খাদ্য সাপ। সাপকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পা এগিয়ে একেবারে ঘাড়টা মটকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে মেরে ফেলে। এতে সাপ বিষ ছড়াতে পারে না।

এরা যখন কাউকে আক্রমণ করে তখন পিঠের ওপরের ছোট পাখা-গুলোকে সামনে নিয়ে আসে। ঢালের মতো ব্যবহার হয় এগুলোর। এ-ভাবে সেক্রেটারি বার্ড নিজেকেও অন্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

গার্ডেনার বার্ড

নিউগিনির জঙ্গলের অদ্ভুত এক পাখির নাম গার্ডেনার বার্ড। এরা রঙিন জিনিস পছন্দ করে। দেখতে অনেকটা চড়ুই পাখির মতো। বুকের নিচে হলকা কমলা রংয়ের প্রলেপ।

এদের নাম গার্ডেনার বার্ড হয়েছে যথার্থ কারণেই। এরা খড় দিয়ে ছোট্ট কুঁড়েঘরের মতো সুন্দর বাসা তৈরি করে। বাসার চার-ধারে নানান গাছের ফুল, রঙিন কাগজ, ঝিনুক ইত্যাদি এনে তৈরি করে বাগান। এগুলো এরা এমনভাবে সাজিয়ে রাখে যে, তা বেশ চমৎকার দেখায়। পাখিগুলো সব সময়ই ব্যস্ত থাকে। রঙিন কাগজ খুঁজে আনে। ঝিনুক খুঁজতে চলে যায় সমুদ্র পাড়ে। গাছ থেকে কেটে আনে নানা রংয়ের ফুল। পরিপাটি করে সাজিয়ে তোলে ঘরের চার পাশ।

এদের মুখের লালা গাছের পাতার সাথে লাগিয়ে ওটা তুলির মতো ব্যবহার করা যায়। ঘরের মেঝে নানান ডিজাইনে ভরে দেয়া যায়।

মৌমাছিভুক পাখি

ইংরেজিতে এদের বলা হয় 'বী ইটার'। পাখি বিজ্ঞানীরা এদেরকে বিশ্লেষণ করে মাছরাঙার বংশধর বলে ধারণা করেছেন। মাথা সবুজ। চোখের কোনো লাল লাল নরম লোমে আবৃত। বুকের নিচে নীল রংয়ের প্রলেপ। বাদামী রংয়ের ঠোঁট। লম্বা লেজ। এদেরকে ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়।

মৌমাছিভুক পাখিরা অদ্ভুত বাসা তৈরি করে। লম্বা ঠোঁট দিয়ে এরা নদীর খাদে লম্বা সুড়ঙ্গ করে বাসা বানায়। সুড়ঙ্গের মাঝখানে ঘুমানোর জন্যে নরম গদির বিছানা তৈরি করে। গদি তৈরি করতে এরা মৌমাছি, প্রজাপতি এবং অন্যান্য পোকামাকড়ের বিচিত্র রংয়ের ডানা ব্যবহার করে।

মৌমাছি ভুক পাখির প্রধান খাদ্য হলো মৌমাছি। এরা এক সাথে দশ-বারোটা মতো মৌমাছি একবারে মুখে পুরে। সকল থেকে সন্ধে পর্যন্ত উড়ে বেড়ায়।

তোতা ও ময়নার কথা বলা

এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় তোতা ও ময়না পাখি বেশি দেখা যায়। অন্যান্য পাখিদের চেয়ে এরা বেশ বুদ্ধিমান। এরা মানুষের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করতে পারে। ঠিক মতো শিক্ষা দিলে মানুষের মতো অনেক শব্দ এবং ছোট ছোট বাক্যে কথা বলতে পারে।

মানুষের ঠোঁট নাড়া দেখে এরা স্বর নকল করে। অনেকের মতে, এদের লম্বা এবং পুরু জিহ্বার জন্যে অমন কথা বলতে পারে এরা। এদের কথা বলার ধরন এবং শোনার যান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ খুব ধীর গতিতে হয়। যার ফলে যে শব্দ তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তা শুনতে অনেকটা মানুষের কণ্ঠস্বরের মতোই লাগে। (১৮৬৫ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাচাল বলে লণ্ডনে একটি তোতাকে পুরস্কৃত করা হয়েছিলো।) মজার ব্যাপার হলো—মানুষের মতো কথা বলতে পারলেও তার অর্থ বোঝে না এরা।

তোতা অনেক প্রজাতির আছে। তবে অধিকাংশেরই গায়ের রং সবুজ। দৈর্ঘ্য ১৫ থেকে ৯০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় লম্বা লেজঅলা 'ম্যাক' নামের তোতা পাখি দেখা যায়। এদের দৈর্ঘ্য ৯০ সেন্টিমিটার। ('কিয়া' নামক তোতা পাখি ৫০ সেন্টিমিটার লম্বা। এদের দেখা যায় নিউজিল্যাণ্ডে।)

(সব প্রজাতির তোতাপাখির ডিমের রং শাদা।) এদের ঠোঁট ধারালো সূচালো। শাকশব্জি, কাচা মরিচ, বিভিন্ন ধরনের ফল এদের প্রিয় খাদ্য। (তোতা পাখি সাইটাকোসিস নামের রোগ জীবাণু বহন করে। এরা সাধারণত ৫০ বছর বাঁচে।)

পাখি দেখা

পাখি মানুষের কাছে পোষ মেনেছে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে। জঙ্গী মোরগ কিংবা হাঁসকে মানুষ পোষ মানাতে শিখিয়েছে প্রথম। এদের কাছ থেকে মানুষ পেয়েছে ডিম, মাংস।

আমরা জানি গাছ না থাকলে পৃথিবীর সর্বনাশ হবে। পাখিরা পোকা না খেয়ে ফেললে পোকারাই গাছ শেষ করে ফেলতো। তখন গাছশূন্য পৃথিবীটা হয়ে যেতো মানুষ বাসের অযোগ্য। তাই পাখিরা মানুষের অশেষ উপকার করছে এভাবে পোকা খেয়ে। হাজার রকমের পাখি গান গেয়ে মন খুশি রাখছে মানুষের।

পাখিরা প্রকৃতিতে পোকার ভারসাম্য ঠিক রাখছে। পোকার ডিম থেকে পূর্ণবয়স্ক পোকা পাখির খাদ্য তালিকার প্রধান উপাদান। জন্মের পর প্রথম কদিন পাখির ছানারা শুধু পোকা খেয়ে থাকে। নিজের ওজনেরও বেশি খাবার একদিনে তারা খেয়ে নেয়। বর্ষাকালে আমরা দেখি পানিতে বা ডাঙাতে যেমন পোকা, তেমনি পাখিরাও অগুনতি পোকা ধরে নিয়ে খাচ্ছে আর খাওয়াচ্ছে বাচ্চাদের।

কিন্তু বর্তমানে যে হারে পোকার বংশবৃদ্ধি হচ্ছে, পাখিরা নিঃসন্দেহে তার সাথে তাল মেলাতে পারছে না। এ কারণে এখন পোকা মারার

ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে। তবু পাখিরাই যে প্রকৃতিতে পোকার সংখ্যা কিছু কমিয়ে রাখে এ-কথা মানতেই হবে।

পাখি ফসল কিংবা ফল নষ্ট করে সত্যি কিন্তু তুলনামূলকভাবে ইঁদুর এবং পোকা ফসলের যতটা ক্ষতি সাধন করে সেদিক থেকে বিচার করলে পাখির দিকের পাল্লা কম ভারি হবে। ইঁদুর, পেঁচা ও বাজের প্রিয় খাবার। সে হিসেবে ইঁদুর খেয়ে ফসলকে রক্ষা করে এক জাতের পাখি।

কোনো কোনো পাখি ফুলের মধু খেতে গিয়ে রেণু মিলিয়ে দেয়। আবার এক জাতের পাখি ফল খেয়ে তার বীজ দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দেয়। উদ্ভিদের বংশ বিস্তারে সাহায্য করে পাখি।

সেই আদিকাল থেকেই মানুষের পাশাপাশি বাস করে আসছে পাখি। সকাল বিকেল সন্ধে সব সময় ডেকে মুখরিত করছে চারপাশ। বনে-বাদাড়ে, পাহাড়-পর্বতে, জলাশয়, নির্জনে-লোকালয়ে সব জায়গাতেই আছে পাখি। বিভিন্ন আকারের। বিচিত্র বর্ণের। তাদের রং আর ডাক মানুষের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে। আর এই কৌতূহল থেকেই মানুষের মনে জন্মে পাখি দেখার ইচ্ছে। পাখিকে পর্যবেক্ষণ করে মানুষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

এই পাখি দেখার ইচ্ছে বা শখ মানুষের মনে কবে জন্মেছে তার সঠিক ইতিহাস নেই। তবে সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই পাখির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তার বহু প্রমাণ আছে।

সংস্কৃত কাব্যের জন্মলগ্ন থেকে পাখি পর্যবেক্ষণের একটি ধারা এদেশে দেখা যায়। কবি বাল্মীকির মুখ থেকে যে আদি শ্লোকটি উচ্চারিত হয়েছিলো তার মূলে ছিলো একটি চকাচকি হাঁসের বিরহ-বেদনার বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তীকালে কালিদাস ও বাণভট্টও যে কৌতূহলী পাখি-প্রেমিক এবং পর্যবেক্ষক ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের বিভিন্ন রচনাতে।

কালিদাস তাঁর বহু রচনায় নিখুঁতভাবে পাখির আকার, আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। 'মেঘদূত,' 'ঋতু সংহার' প্রভৃতি কাব্যের শ্লোকে শ্লোকে ছড়িয়ে আছে দেশান্তরী চাতক, বলাকা, ময়ূর, শালিক, কাক, পায়রা, নীলকণ্ঠ, বালি হাঁস, সারস, কোকিলের কথা। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন পাখির আচার-আচরণ তিনি সুন্দরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এবং নিখুঁতভাবে লিখেছেন। ময়ূরের চোখের রং বাদামী। চোখের চার-পাশে থাকে একটি শাদা রঙের বৃত্ত। এটির উল্লেখ কালিদাসের সযত্ন পাখি-পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি।

কালিদাসের পরেই উল্লেখযোগ্য হলেন বাণভট্ট। তাঁর 'কাদম্বরী'তে পম্পা সরোবরের পাশের একটি বনের বর্ণনা আছে। ঐ বনে বাস করতো বিভিন্ন ধরনের পাখি। একদিন এক শিকারী আসে। তার অত্যাচারে পাখিরা অতিষ্ঠ হয়। গৃহহারা হয় পাখিরা।

এগুলোর বর্ণনায় যে চিত্রময় রূপ ফুটে উঠেছে বাণভট্টের ভাষায় তা অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি না থাকলে সম্ভব হতো না। প্রতিটি পাখির আকৃতি ও প্রকৃতি তিনি যত্নের সাথে লক্ষ্য করেছেন। মন দিয়ে দেখেছেন পাখিদের বাসার বৈশিষ্ট্য।

শুধু সংস্কৃত কাব্যেই নয়, বৌদ্ধ জাতকের গল্পে এবং হিতোপদেশে ও পঞ্চ-তন্ত্রে প্রাচীন বাংলার পাখিরা আছে বিশিষ্ট স্থান জুড়ে। টিয়ে, কাক, ঘুঘু, পেঁচা, রাজশকুন, তিতির প্রভৃতি অসংখ্য পাখির উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন সেকালে এ-দেশের টিয়ে এবং ময়ূরের বিশেষ চাহিদা ছিলো রোমের অভিজাত পরিবারগুলোতে। সম্রাট ক্লডিয়াস একবার এ-দেশ থেকে বহু টাকা খরচ করে একটি পাখি নিয়ে যান। পাখিটি ছিলো বিচিত্র বর্ণের তিংহংস বা সোনালি ফেজান্ট।

পাখি দেখার কৌতূহল মেটাতে হলে বেরিয়ে পড়তে হবে ঘর থেকে। পাখি দেখার সময় হিসেবে শরৎ, শীত, বসন্ত ঋতুই উপযুক্ত সময়। বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে, খাল-বিল, নদী-নালাতে অসংখ্য পাখি দেখতে পাওয়া যায় এ-সময়। দেশান্তরী পাখিরা এসে ভিড় জমায়। এমন কি শহরের ভেতরেও এই সময় অনেক পাখিকে আসতে দেখা যায়। অনেক পরিব্রাজনকারী পাখিরা তাদের বৈচিত্র্য মেলে ধরে।

যারা পাখি পর্যবেক্ষণ করতে আগ্রহী তাদের কাছে এ-সময়টা বেশ উপযোগী। আর এই পর্যবেক্ষণে প্রাথমিকভাবে কিছু শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে। আগে জানতে হবে, বুঝতে হবে। পাখি চেনার ব্যাপারে ঠিকমতো লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, কি কি বৈশিষ্ট্য আছে পাখিটির। যেমন, হয়তো একটি পাখি দেখা গেলো। প্রথমেই নজর রাখতে হবে পাখিটির রং কি। শরীরের ঠিক কোন্ অংশে কোন্ কোন্ রং রয়েছে। ঠোঁটের আকৃতি এবং রং কেমন। লেজের ও পায়ের গঠন কি। পায়ের ও চোখের রং কেমন। ঝুঁটি আছে কিনা মাথায়, সবই খেয়াল রাখতে হবে।

অবশ্য এমন অনেক চঞ্চল পাখি আছে যাদেরকে এতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব নয়। কাজেই প্রথমেই একসঙ্গে সব কিছু না দেখে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা দরকার। আর একটি পাখি দেখার সময় অন্য একটি তুলনামূলক পাখির সাথে মিলিয়ে মনে রাখলে সুবিধে হবে। আর অনেক সময় স্মরণশক্তি হয়তো কাজ না-ও করতে পারে। তাই দেখার সাথে সাথে খাতায় লিখে রাখা ভালো।

পাখির ডাক শুনে পাখি পর্যবেক্ষণ করা যায়। তবে তার ডাকটি লিখে রাখা একটু কষ্টকর। পাখি দেখার সময় আরো লক্ষ্য রাখতে হবে পাখিটি কোথায় কখন কি ভাবে দেখা গেলো। কি ভাবে বসে ছিলো এবং কোথায়। চলার সময় হেঁটে না লাফিয়ে চলে। কি ভাবে আহার

করে। উড়ে চলে কি ভাবে। এমন ধরনের বহু বিষয় দেখে পাখিদের চিনে নিতে হয়। প্রথম প্রথম হয়তো অসুবিধে দেখা দিতে পারে একজন নতুন বার্ড ওয়াচারের। কিন্তু কিছুদিন অভ্যেস হয়ে গেলে দেখা যাবে পাখি চিনে নিতে আর কোনো কষ্টই হচ্ছে না। বিভিন্ন গোত্রে বা প্রজাতির পাখিদের বৈশিষ্ট্যগুলো ধরা পড়ছে চোখের সামনে। পাখি পর্যবেক্ষণের জন্যে আর একটি সহায়ক বিষয় হলো পাখিদের বাসা। পাখিদের বাসার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার। বাসা থেকে পাখিদের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। কে কি ভাবে বাসা বানায়। কোথায় তাদের বাসাটি বানায়। কখন ডিম পাড়ে। ডিমের সংখ্যা এবং রং কি। বাচ্চাদের লালন-পালন অর্থাৎ পাখিদের দৈনন্দিন কাজ-কর্মের প্রতি নজর রাখা। তার পাশাপাশি তাদের খাদ্যের তালিকাও তৈরি করা। আর এ-ভাবে পাখিদের পরিচয় বের করা সম্ভব।)

পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, নদ-নদী-হাওর-বিল ঘুরে আর বনো-বাদাড়ে মিশে গিয়ে পাখি দেখা এক দারুণ মজা। প্রকৃতির মাঝে মিশে গিয়ে এ যেন পাখিদের সাথে মিতালি। নতুন দেশ আবিষ্কারের মতোই লাগে পাখিদের পরিচয় আবিষ্কারকে। আর সত্যি দীর্ঘ দিন পাখি দেখতে দেখতে তাদের সাথে গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ মমত্ববোধ। আর তখনই এদের জন্যে আমরা সচেতন হয়ে উঠি। শুধু কি তাই। পাখি দেখা যেমন একটি শখের বিষয়। তেমনি এতে আনন্দ আছে প্রচুর।

পাখি পর্যবেক্ষণের ব্যাপার অতীতে বহু হয়েছে। কিন্তু আধুনিক পরিভাষায় 'পাখি পর্যবেক্ষণ' বা 'পাখি দেখা' বলতে যা বোঝায় ঠিক সেই ধরনের পর্যবেক্ষণ প্রাচীনকালের মানুষদের মধ্যে ছিলো না। সেই অর্থে বলা যায় ইংরেজদের রাজত্বের পূর্বে আমাদের দেশে আধুনিকভাবে পাখি-চর্চা হতো না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মরত কিছু বৃটিশ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী তৎকালীন ভারতবর্ষের পাখিদের ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন। সেটা ছিলো উনিশ শতকের প্রথম দিকের কথা। ১৮৬৪ সালে এ-দেশের পাখিদের উপর প্রথম একটি বই প্রকাশিত হয়। লেখক ছিলেন টি.সি. জার্ডন। বইটির নাম 'দি বার্ডস অব ইণ্ডিয়া'। তখন এ-ব্যাপারে অনেকে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বহু পাখিরই নাম তখন অজানা ছিলো। পাখি-পর্যবেক্ষকেরা পাখিদের এ-সময় নাম, শ্রেণী ও জাতিগোত্র বিচারে মনোযোগী হলেন।

টি.সি. জার্ডনের বইটিতে প্রত্যেকটি প্রজাতি, আকার-আকৃতি, গায়ের রং, পালক, ডানা ছাড়াও আচার-আচরণ, খাদ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিলো। (বইটি পড়ে অনেকে উৎসাহী হয়ে পাখি দেখতে শৌখিন পাখি পর্যবেক্ষক হয়ে গেলো।) পরবর্তী আরো পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে আরো বেশ কটি বই এবং পত্রিকা প্রকাশিত হলো। পথে-ঘাটে মাঠে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বিভিন্ন পাখির তথ্য সংগ্রহ করে এ-সমস্ত পুস্তিকায় লেখা হতো। এগুলোর মধ্যে স্ট্রে ফেদার্স, দি ফওনা, নিউ কলো উল্লেখযোগ্য। এগুলোতে সিন্ধু, আসাম, বাংলাদেশ, বার্মা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে পাখিদের নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা লেখা হতো।

(বিশ্বের পাখি বিজ্ঞান বেশ এগিয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশে পাখিদের জন্যে তৈরি করা হয়েছে অভয়ারণ্য। পাখি দেখার ক্লাব যেমন হয়েছে তেমনি বেড়েছে পর্যবেক্ষকের দল, পাখি বিজ্ঞানীর সংখ্যা। অনেক রকম বইপত্তর বেরিয়েছে পাখিদের সচিত্র বিষয়-আশয় নিয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, এই বাংলাদেশে পাখি চর্চার প্রসার ততটা হয় নি। কিছু উৎসাহী আছেন যারা সৌখিন 'বার্ড ওয়াচার,' তার সংখ্যা খুবই কম।

নগণ্য। পাখি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুব কম হচ্ছে। ফলে আমাদের অবহেলায় এবং অত্যাচারে অনেক প্রজাতির পাখি এ-দেশ থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। আরো অনেক প্রজাতি লুপ্ত হবার পথে।)

বর্তমানে এই বিজ্ঞানের যুগে পর্যবেক্ষণের অনেক সুবিধে হয়েছে। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছে। যাতে খুব সহজেই গবেষণার কাজ চালিয়ে নেয়া যায়। (ফটো লেন্স ক্যামেরা টেলিস্কোপসহ তৈরি হয়েছে নানা জাতের বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম। পাখিদের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবন্ত আচার-আচরণ, জীবন যাত্রা প্রণালী সব এখন সহজেই জানা সম্ভব।)

(দেশে-বিদেশে অসংখ্য পাখি-প্রেমিক প্রতিদিন পাখি দেখে চলেছে। পাখি পর্যবেক্ষক বা বার্ড ওয়াচাররা সাধারণত দুই শ্রেণীর। পেশাদার ও অপেশদার। আমেরিকাতে বার্ড ওয়াচারদের সংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষ। পাখি পর্যবেক্ষণ একটি মজার বিষয়। অনেকেই কৌতূহল মিটাতে শখ করে পাখি দেখার দলে ভিড়ে পড়ে। পাখি পর্যবেক্ষণের সময় চারটি জিনিস সাথে থাকা প্রয়োজন। তা হলো—একটি দূরবীন, পাখিদের পরিচিতমূলক বই, একটি খাতা ও লেখার জন্যে কলম। নইলে পাখি দেখার মজা পুরোপুরি পাওয়া যায় না। কারণ অনেক সময় অচেনা একটি পাখি সামনে পড়ে গেলে তার গড়ন, আকার-আকৃতি পর্যবেক্ষণ করে লিখে রাখতে হয়। আর পাখিদের পরিচিতমূলক বইটি সাহায্য করে গাইড বুক হিসেবে। পরিচিত পাখিদের চেনা যায় এ থেকে।)

এই উপমহাদেশের মানুষরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই যে পাখিদের পর্যবেক্ষণ করে আসছে তার আর একটি প্রমাণ মহেঞ্জোদাড়ো ও হরোপ্পা। প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এই দুটি স্থান থেকে বহু প্রাচীন চিত্রফলক পাওয়া গেছে। প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের পুরনো এই মাটির চিত্র

ফলকগুলোতে রয়েছে অসংখ্য পাখির ছবি। ময়ূর ও হাঁসের ছবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়া পঞ্চম শতকে আঁকা অজন্তার ভিত্তি-চিত্রে নানা প্রজাতির হাঁস এবং পাখির ছবি দেখা যায়। বাস্তবধর্মী এই ছবিগুলো শিল্পীদের পাখি-প্রীতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে বা পদ্ধতিগতভাবে এ-দেশের প্রথম পাখি পর্যবেক্ষক হিসেবে অনেকেই সম্রাট জাহাঙ্গীরের কথা উল্লেখ করেন। বাবরও পাখি-প্রেমিক ছিলেন।. বাদশাহ জাহাঙ্গীর শুধু পাখি পর্যবেক্ষণ করেই চুপচাপ বসে থাকেন নি। বিশিষ্ট চিত্রকর ওস্তাদ মনস্থরকে দিয়ে অনেক দুষ্প্রাপ্য এবং বিচিত্র পাখির ছবি অংকন করিয়েছিলন। চিত্রকর মনস্থরও ছিলেন গুণী শিল্পী এবং পাখি পর্যবেক্ষক। নিপুণভাবে তিনি পাখির ছবি এঁকেছেন বিভিন্ন চিত্রকর্মে। তাঁর এই চিত্রকর্মগুলো এখনো অতীতের মানুষদেব পাখি-প্রীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রাচীন মিশরে, জাপানে, চীনে প্রভৃতি দেশেও পাখিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে সেই অতীত থেকেই। মিশরে 'ইতেরে' কবরস্থান থেকে পাওয়া গেছে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের আঁকা একটি মুরাল ছবি, নীল নদের অববাহিকায় বছরের একটি বিশেষ সময়ে যে-সব বুনোহাঁস আসতো তার। প্যাপিরাস আর সরবনে বাসা বাঁধতো তারা। তাদেরই ছবি এঁকেছেন শিল্পী। নিপুণ হাতে হাঁসের আকৃতি, ঠোঁট, চোখ, পালকের রং সবই আঁকা হয়েছে। আর একটি চিত্র পাওয়া গেছে নাখতের সমাধি-মন্দিরে। এই ছবিটিতে আঁকা হয়েছে একজন শিকারীর জালে আটকা পড়েছে মিশরীয় হাঁস, দিগ হাঁস, সারস এবং বেশ কিছু জলচর পাখি। এই ছবিটিতেও পাখিগুলো বেশ জীবন্ত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে খৃষ্টের জন্মের দেড় হাজার বছর আগেও মিশরের মানুষ পাখিদের পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ-ছাড়াও মিশরীয় সব দেব-দেবীই

পাখির মূর্তিধারী। সূর্যদেব হোরাসের মুখ বহেরি বাজের মতো, মৃত্যুদেব সেকের মুখ শিকারী বাজের মতো। প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে পবিত্র পাখি ছিলো শকুন। অনেক দেব-দেবীর মুখও শকুনের মতো। অসংখ্য পাখি আর পাখিমুখো দেব-দেবীর প্রাপ্ত পুরাকীর্তি থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীন মিশরের অধিকাংশ লোকই ছিলো পাখি-প্রেমিক।

চীনদেশেও পাখি দেখার আগ্রহ বহুকাল থেকে লক্ষ্য করা যায়। ১১ শতকে সম্রাট হুই-ইৎসোঙ নিজেই ছিলেন পাখি-প্রেমিক এবং শিল্পী। আর এই কারণে তিনি পাখির ছবি এঁকে গেছেন নিপুণ হাতে। তাঁর আঁকা ফুল ও বটের ছবিটি বিখ্যাত। জাপানের যাদুঘরে ছবিটি সংরক্ষিত আছে। ছবিটি দেখলে বোঝা যায় শিল্পী কতো আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন পাখিটিকে এবং কতো যত্নের সাথে ফুটিয়ে তুলেছে। এ-ভাবে নাম জানা-অজানা বহু চীনা শিল্পীদের আঁকা ছবিতে পাখিরা স্থান পেয়েছে।

পাখিদের প্রতি মানুষের চিরন্তন ভালোবাসা এবং পর্যবেক্ষণশীলতা ধরে রেখেছে জাপানী শিল্পীরা। আর তাঁদের ছবিগুলো পাখি দেখার আনন্দ ও অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করছে। পঞ্চাশ শতাব্দীর কৃতি শিল্পী সেশু অনেকগুলো পাখির ছবি এঁকেছেন। তার একটি বিখ্যাত ছবি হলো সোনালি ফেঝান্টের ছবি। এ-ছাড়াও পরবর্তী শিল্পী কানো সানসেত্সু, কানো ইতোকু, হকুসাই, কোরিউসাই, বিভিন্ন শিল্পীরা এঁকেছেন পাখিদের চমকপ্রদ জীবন্ত ছবি। জাপানের চিত্রকলায় মানুষের পরেই স্থান পেয়েছে পাখি।

গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ

পাখি বিষয়ে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ বাংলাদেশে এখনো পুরোপুরি চালু হয় নি। একেবারে প্রাথমিক অবস্থাতেই থেকে গেছে। ১৯৫০ সালে 'সিস্টেমেটিক লিস্ট অফ দি বার্ডস অফ ইস্ট পাকিস্তান' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো। বইটির লেখক ছিলেন হারুনর রশীদ। সে সময়ই অনেকে পাখিদের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং পাখিদের পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা শুরু করেন। কিন্তু খুবই নগণ্য ছিলো এ-সব অনুসন্ধান কাজ। (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগে অল্প-বিস্তর কিছু করা হচ্ছে। এ-ব্যাপারে অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেনের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় পাখি সংগ্রহ অভিযান উল্লেখযোগ্য।)

তিনজন ছাত্র সিরাজগঞ্জ, রংপুর, ফরিদপুরের পাখিদের নিয়ে গবেষণা চালান। পরের বছর চড়ুই, ঝুঁটি শালিক ও ভাত শালিকের প্রজননসহ অন্যান্য বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করা হয়।

আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্মত বা আধুনিক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কাজের ভিত্তি সূচিত হয়।

বর্তমানে দেশে পাখিদের অভয়ারণ্য গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে দুটি স্থান। নোয়াখালির চরমজিদ এবং মহেশখালীর সোনাদিয়া দ্বীপে হবে এই অভয়ারণ্য।

পাখি শিকার

আমাদের দেশে পাখি শিকার নিয়ন্ত্রণ করার আইন জারি আছে। তবুও এখনো দেশের গ্রামাঞ্চলে, বনে-বাদাড়ে, বিলাঞ্চলে, পাখি শিকারীদের দেখা যায়। বন্দুক হাতে সৌখিন শিকারীরা ঘুরে বেড়ায় পাখির সন্ধানে। নির্বিচারে পাখি হত্যা করে। এ-ছাড়াও পেশাদার পাখি শিকারীর জালে ধরা পড়ে অজস্র পাখি। অবাধে বিক্রি হতে দেখা যায় শহরের বিভিন্ন স্থানে। কিন্তু এ-ভাবে যদি পাখি শিকার চলতে থাকে তাহলে আমাদের পাখিরা শেষ হয়ে যাবে। দেশ হয়ে যাবে পাখিশূন্য।

কাজেই এ-ব্যাপারে আমাদের সচেতনতার প্রয়োজন সবচেয়ে আগে। নিয়ম মেনে চলা কর্তব্য। পাখিদের জীবন ধারণে আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করা দরকার।

পাখি-বিষয়ক ভুল ধারণা

আমাদের দেশে পাখিদের সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা আছে। আদ্যি-কাল থেকেই এগুলো কুসংস্কার হিসেবে চলে আসছে। আসলে কিন্তু এ ধারণাগুলো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

কাকের কর্কশ ডাক আমাদের বিরক্তির কারণ ঠিকই। তবে অনেকেই কাকের ডাককে অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে ধরে নেয়। আসলে এ ভাবনা কিন্তু অর্থহীন। অনেকে আবার পায়রা বা কবুতরকে শান্তির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেন। তবে এদের ভেতরের হিংসাত্মক ঝগড়াঝাটি এবং মারামারি দেখলে কিন্তু তা মেনে নেয়া যায় না।

পেঁচাকে কেউ কেউ শিক্ষা এবং জ্ঞানের প্রতীক বলে মনে করেন। আবার কেউ কেউ এই পেঁচাকেই অশুভ শক্তির দূত ভাবেন। পেঁচার ডাক শুনলে ভয়ে আঁতকে উঠেন। অনেকে মনে করেন শকুন দীর্ঘ দিন

অর্থাৎ পাঁচ ছয় শত বছর বাঁচে, তাই কাউকে আশীর্বাদকালে তার শকুনের মতো আয়ু কামনা করে।

আসলে পাখি সম্পর্কে মানুষের এই ধারণাগুলো ভ্রান্ত এবং নিতান্তই অমূলক। এ-সব কুসংস্কার অর্থহীন। আমাদের জানা দরকার। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা দরকার। আসলের পাখিরা কতোটুকু উপকারী বা অপকারী।

গ্রন্থপঞ্জি

সাধারণ পাখি : সলিম আলী, লাইক ফতেহ আলী

বাংলার পাখি : অজয় হোম

পাখির পৃথিবী : বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

কাছের পাখি দূরের পাখি : বিপ্রদাশ বড়ুয়া